ISLAMIC MANNERS

আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ

ভাষান্তর
আলী আহমাদ মাবরুর

আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ

আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহর জন্ম ১৯১৬ সালের ৯ মে ঐতিহ্যিক শহর আলেপ্পোতে। নিজ শহরে পড়াশোনা শেষ করার পর আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শরিয়া অনুষদ হতে ১৯৪৮ সালে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন। তিনি দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস এবং ফিকহ ইসলামির বিশ্বকোষ প্রণয়নে প্রধান সমন্বয়কের দায়িত্বও পালন করেন।

১৯৯৬ সালে সিরিয়ায় সংগঠিত সামরিক অভ্যুত্থানের সমালোচনা করার কারণে দীর্ঘ এগার মাস জেলে কাটান। ইসরাইলের সাথে ছয়দিন ব্যাপী যুদ্ধের পর সকল বন্দিদের সাথে মুক্তি পান।

এরপর সৌদি আরবের ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাক্রম ও মানহাজ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

মিশরে অধ্যয়নকালে তিনি ইমাম হাসান আল বান্না-সহ যুগের শ্রেষ্ঠ আলেম ও দাঈদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পান। উসতায মুসতাফা আস সিবাইর ইন্তেকালের পর তিনি সিরিয়ায় ইখওয়ানুল মুসলিমিনের মুরশিদের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। কিন্তু কিছুদিন পর ইলমি গবেষণার প্রয়োজনে ইখওয়ানের দায়িত্ব ছেড়ে পুনরায় মিশর চলে যান। তিনি ইরাক ও পাক-ভারত উপমহাদেশ সফর করেন। শাইখ যাকারিয়া কান্ধলভি, ইউসুফ কান্ধলভি, আবুল হাসান আলি নদভি, মুফতি মুহাম্মাদ শফি প্রমুখ আলিমদের সাথে মতবিনিময় ও সাহচর্যে দীর্ঘ সময় কাটান। তিনি ড. ইউসুফ কারযাভির সাথে ইউরোপ সফরে দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন সভা-সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। বিবদমান ইসলামি গ্রুপগুলোর সাথে মীমাংসা করতে তিনি আফগানিস্তানও সফর করেন।

শাইখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ গবেষক আলিম ও দাঈ হিসেবে বিশ্বব্যাপী সুপরিচিত। সকল ইলমি মহলে গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত স্কলারদের মধ্যে তিনি শীর্ষস্থানীয়। তাঁর লিখিত গ্রন্থাবলি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে অবদান রেখে চলেছে।

১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭ সালে উসতায আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ ইন্তেকাল করেন।

প্রকাশকের কথা

ম্যানারস বা শিষ্টাচার যেকোনো ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। শিষ্টাচার মানুষের চরিত্রকে সুন্দর ও সুশোভিত করে। রাসূলুল্লাহ সা. শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন সর্বোত্তমভাবে। হাদিসের সব গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থে 'কিতাবুল আদাব' শিরোনামে শিষ্টাচারের বিস্তৃত অধ্যায় রয়েছে। এ থেকে অনুভব করা যায়, শিষ্টাচার মানবজীবনে কতটা গুরুত্ববহ।

শিষ্টাচার শেখার প্রাথমিক ও সবচে প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে পরিবার। প্রতিটি পরিবার ও অভিভাবকের দায়িত্ব– ছোটোদের আদব শিক্ষা দেওয়া। শিষ্টাচারের শিক্ষা পাওয়া প্রতিটি শিশুর অধিকার। এ দায়িত্বে অবহেলা পরবর্তী সামাজিক অঙ্গনে লজ্জার কারণ হয়ে থাকে। আর আদবহীনতা বয়ে আনবে আখিরাতের জীবনের ক্ষতিও। তাই এ বিষয়ে প্রত্যেক অভিভাবকের সতর্ক সচেতনতা জরুরি। পাশাপাশি শিষ্টাচার অনুশীলনেরও বিষয়। তাই শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার সাথে সাথে বড়োদেরও এ বিষয়ে অনুশীলন করতে হয়। চর্চার মাধ্যমে তা আরও বিকশিত ও সৌন্দর্যময় হয়ে ওঠে।

বিশ্ববিখ্যাত আলিম, শিক্ষক ও দাঈ শাইখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ মরহুমের *ইসলামিক ম্যানারস* বইটি শিষ্টাচার শিক্ষা ও অনুশীলনে আমাদের জন্য গাইডবুক হতে পারে।

আলহামদুলিল্লাহ! করোনাকালীন পরিস্থিতিতে লকডাউন কিছুটা শিথিল করা হলে বিগত জুলাই মাসের শেষদিকে আমরা বইটি প্রথম প্রকাশ করি। এরকম একটি দুর্যোগময় পরিবেশের মধ্যে বই কতটুকু চলবে তা নিয়ে আমরা ছিলাম সন্দিহান। আল্লাহ পাকের অশেষ দয়ায় পাঠকসমাজে এ বই আশাতীত গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে। মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে প্রথম ও দ্বিতীয় মুদ্রণের সকল কপি শেষ হয়ে গেল। পাঠকের সমীপে এখন তৃতীয় মুদ্রণের বই তুলে দিতে পেরে তৃপ্তি অনুভব করছি।

প্রকাশক

প্রচ্ছদ প্রকাশন

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। শাইখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহর *ইসলামিক ম্যানারস* বইটির অনুবাদ সম্পন্ন করতে পারলাম। এর আগে আমি *মুসলিম চরিত্র* শিরোনামে একটি বই অনুবাদ করেছি। চরিত্রের বিষয়টি একটু ব্যাপক। মানুষকে নিরন্তর তার চরিত্রের উন্নয়নে কাজ করে যেতে হয়। প্রত্যাশিত চরিত্র হয়তো এক জনমেও পুরোপুরি ধারণ করা হয়ে উঠে না। তারপরও আমাদের ফেলে আসা দিনের তুলনায় প্রতিদিন একটু একটু করে নিজেকে উন্নত করার চেষ্টা করতে হয়। সে বিবেচনায় ইসলামি শিষ্টাচার ও আদবগুলো জীবনযাপনের সাথে আরও বেশি নিকটতর ও প্রাসঙ্গিক। আমাদের যাপিত জীবনে আমরা যেভাবে চলি, কাজ করি, তার সাথে এই আদবগুলো ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই শিষ্টাচারগুলো চর্চার জন্য কোনো সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা হাতে নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। চাইলে যে কেউ যে কোনো মুহূর্ত থেকে এই আদবগুলোর অনুশীলন শুরু করতে পারেন।

লেখক শাইখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ এ বইটিতে চমৎকারভাবে ইসলামের নির্দেশিত কিছু আদবকে কুরআন-সুন্নাহর রেফারেন্সের ভিত্তিতে তুলে ধরেছেন। মুসলিমদের ধর্মীয়, সামাজিক, পেশাগত কিংবা ব্যক্তিগত জীবনযাপনের ক্ষেত্রে ইসলাম কিছু শিষ্টাচার নীতিমালা প্রণয়ন করেছে– এ বিষয়ে কুরআন-হাদিসে অজস্র বর্ণনা পাওয়া যায়। লেখক এ বইয়ে তার সুন্দর সম্মিলন ঘটিয়েছেন। ভাষান্তর করতে গিয়ে অতি সংক্ষিপ্ত মনে হওয়ায় প্রাসঙ্গিক অল্প কয়েকটি হাদিস বিভিন্ন পরিচ্ছেদে সংযুক্ত করেছি।

এ বইটিতে বিস্তারিত বর্ণনায় যাওয়ার আগে শুরুতেই শিষ্টাচার মানার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। তারপর, আমাদের নিত্য-নৈমত্তিক জীবনের নানা পর্যায়ে যে শিষ্টাচার ও আদবগুলো মানা জরুরি– বিশেষ করে মার্জিত ও শালীন পোশাক পরিধানের গুরুত্ব, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ঘর থেকে বের হওয়া বা ঘরে প্রবেশ করার আদব, সাক্ষাতের আদব, কথোপকথনের আদব, সামাজিকতার আদব, খাওয়ার আদব, বিবাহসংক্রান্ত আদব, অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার আদব,

কোনো নেতিবাচক খবর মানুষকে জানানোর আদব কিংবা ঘুমানোর আদব ইত্যাদি সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ে আবার অনেক ছোটোখাটো ইস্যুকে উপস্থাপন করা হয়েছে– প্রতিনিয়তই আমরা যেসবের মুখোমুখি হই। বিভিন্ন অবস্থা ও পরিবেশে আমরা কীভাবে শিষ্টাচার ও আদব বজায় রেখে চলতে পারি তা এ বইটিতে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ব্যক্তিগতভাবে কাজটি করতে গিয়ে আমি নিজে খুবই উপকৃত হয়েছি। এ বইটি সব শ্রেণির পাঠকের জন্য সুপাঠ্য একটি বই। এখানে যে শিষ্টাচারগুলোর কথা উঠে এসেছে, তা আমল করার মাধ্যমে আমরা প্রত্যেকেই মার্জিত মানুষ হয়ে উঠব– এমনটা প্রত্যাশা করা যায়। বইটি পড়ে আমরা দ্বীনি বিধিবিধান মানার পাশাপাশি আমার পাশে থাকা মানুষদের হক আদায় করতে, তাদের যথাযথ সম্মান দিতেও উদ্বুদ্ধ হব ইনশাআল্লাহ। সামগ্রিকভাবে বইটি আমাদের আলোকিত হতে, ভালো মানুষ হয়ে উঠতে সহায়ক হবে।

পরিবারের সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা। মা, স্ত্রী, সন্তানসহ সকল আত্মার আত্মীয়ের প্রতি ধন্যবাদ। তাদের সাহস, সমর্থন ও সহযোগিতা পাই বলেই আমি এই কাজগুলো করে যেতে পারছি। প্রচ্ছদ প্রকাশনের ভাইদের প্রতিও শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। কোনো একদিন বিকেলে তাদের অফিসে এই বইটি দেখানোর পর তারা আমাকে তাৎক্ষণিকভাবেই কাজটি করার জন্য উৎসাহ জুগিয়েছিলেন। খুবই স্বাধীনভাবে আমি কাজটি করার সুযোগ পেয়েছি– এ কারণে তাদের বাড়তি ধন্যবাদ প্রাপ্য। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলের এই ছোট্ট খেদমতটুকু কবুল করুন। আমিন।

আলী আহমাদ মাবরুর
উত্তরা, ঢাকা

লেখকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। দরুদ ও সালাম পেশ করছি সাইয়িদুনা নবি মুহাম্মাদ সা.-এর ওপর। আল্লাহ তায়ালা তাকে, তাঁর পরিবার ও বংশধরদের, তাঁর সাহাবিদের এবং সকল অনুসারীদের ওপর রহম করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সাহায্য করুন, যাতে আমরা মৃত্যুর আগপর্যন্ত দ্বীন ইসলাম এবং এর সকল শিষ্টাচার ও আদব মেনে চলতে পারি। আমাদের কাজে-কর্মে এর প্রতিফলন ঘটাতে পারি।

এ বইটিতে আমি ইসলামের সুপারিশকৃত খুব সহজ কিছু রীতিনীতি, প্রথা ও অভ্যাস নিয়ে আলোচনা করেছি। আমার বক্তব্যের স্বপক্ষে বেশ কিছু হাদিসকে রেফারেন্স হিসেবে উপস্থাপন করেছি। এই হাদিসগুলোর সবগুলোই সহিহ (নির্ভরযোগ্য) এবং হাসান (আদর্শ মানের)।

আমাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে অনেককেই আমি দেখছি, যারা ইসলামের বিভিন্ন শিষ্টাচার সম্বন্ধে সম্যক ধারণা রাখে না। বরং অনেক ক্ষেত্রে তারা এগুলোর ভুল ব্যাখ্যাও করে। বিষয়টা সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ও সুরভিত ধারণা ছড়িয়ে দেওয়ার নিয়তে আমাকে এ বইটি লেখার কথা ভাবতে হয়েছে। এ বইটির মাধ্যমে ইসলামের সুমহান দৃষ্টিভঙ্গি, আচার-আচরণ ও ব্যবহারিক উৎকর্ষতার বিষয়গুলোকে আরও একবার মুসলিম তরুণ প্রজন্মকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

ইসলামে মানুষের জীবনের প্রতিটি ঘটনা ও ক্ষণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই যাপিত জীবনের আদব ও শিষ্টাচারের গুরুত্বও ইসলামে অপরিসীম। আমি নিজেও পুরোপুরি ও যথাযথভাবে এসব শিষ্টাচার মেনে চলতে পারার দাবি করি না। তারপরও মানুষকে এইসব নেক আমলের বিষয়ে সচেতন করা, এই আমলগুলোর অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করা এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য চেষ্টা করাকে আমি ঈমানের অন্যতম দাবি বলেই মনে করি। রাসূল সা. বলেছেন, "ঈমানদারদের মধ্যে তারাই এগিয়ে থাকবে, যাদের আদব ও শিষ্টাচার উন্নত।" *সুনানে আবু দাউদ*

আমার প্রত্যাশা– এ বইটি মানুষকে দায়িত্ব ও করণীয় সম্পর্কে সচেতন করবে, যেখান থেকে সকল পাঠক বিশেষ করে বিশ্বাসী লোকেরা অনেক বেশি উপকৃত হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তায়ালা যেন দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদের হিদায়াতের ওপর রাখেন। সব ধরনের ওয়াসওয়াসা থেকে তিনি যেন হেফাজত করেন। আমিন।

আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ
রিয়াদ, ১ মহররম, ১৪১২

সূচিপত্র

প্রারম্ভিকা

১.১ শিষ্টাচারের গুরুত্ব

ইসলাম এমন একটি জীবনবিধান, যেখানে জীবনের প্রতিটি ঘটনা ও মুহূর্তের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক শিষ্টাচার ও নৈতিক নির্দেশনার সন্ধান পাওয়া যায়। এসব শিষ্টাচার ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গোটা সমাজের জন্যই প্রযোজ্য। বয়স্ক পুরুষ ও নারী, যুবক-যুবতি, তরুণ-তরুণী প্রায় প্রত্যেককেই এই অনুশাসনগুলো মেনে চলতে হয়।

রাসূল সা. বলেছেন, "নারীরা হলো পুরুষের সম্পূরক।" তাই পুরুষদের যেসব বিধান বা অনুশাসন মেনে চলতে হয়, তা অনিবার্যভাবে নারীদেরও মেনে চলতে হয়। কারণ, নারী ও পুরুষ উভয়ে মিলেই একটি সার্থক মুসলিম সমাজ বিনির্মাণ করে। আর এ ধরনের কাঙ্ক্ষিত ইসলামী সমাজের প্রতিচ্ছবির মধ্য দিয়েই অন্য সবাই ইসলামকে চেনা ও বোঝার সুযোগ পায়।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি তো বটেই, এমনকি অনেক ছোটোখাটো বিষয়েও ইসলামি শিষ্টাচারের সুস্পষ্ট নির্দেশনা পাওয়া যায়। যেমন : বাথরুমে যাওয়া-আসা, কিংবা কীভাবে হাসা সুন্দর, কোন ভঙ্গিতে কথা বলা উচিত ইত্যাদি। আল্লাহর রাসূল সা. বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে স্বভাবের দিক থেকে সবচেয়ে ভালো।"

একবার এক মূর্তিপূজারি রাসূল সা.-এর ঘনিষ্ঠ সাহাবি সালমান ফারসি রা.-কে উপহাস করে বলেছিল, 'তোমাদের নবি তো তোমাদের বাথরুমে যাওয়ারও নিয়ম শেখায়।' সালমান ফারসি রা. সেই ঠাট্টায় মোটেও কাবু হননি। বরং বলিষ্ঠভাবে উত্তর দিয়েছিলেন, 'হ্যাঁ, ঠিকই। রাসূল সা. বলেছেন, আমরা যেন কিবলামুখী হয়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন না সারি। তিনি আরও শিখিয়েছেন, বাথরুম করার পর আমরা যেন ডানহাত দিয়ে পরিচ্ছন্ন হওয়ার কাজটি না করি এবং অন্তত মাটির তিনটি ঢেলা[১] দিয়ে পরিচ্ছন্ন হই; কিংবা যথেষ্ট পরিমাণে পানি ব্যবহার করি।'

---

১. তখন টয়লেট টিস্যুর বিকল্প ছিল মাটির ঢেলা। –অনুবাদক

শিষ্টাচার ও আদবের এতটা গুরুত্ব আছে বলেই প্রতিটি হাদিসগ্রন্থে মুহাদ্দিসগণ শিষ্টাচার বা আদব নামে পৃথক একটি অধ্যায় সংযোজন করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। কারণ, এই শিষ্টাচার বিষয়ে রাসূল সা.-এর অসংখ্য হাদিস, নির্দেশনা ও আমল রয়েছে; পরবর্তী সময়ে সাহাবিরা যা বর্ণনা করেছেন। তাই যাপিত জীবনে এই শিষ্টাচারগুলো নিয়মিত অনুশীলনের আওতায় নিয়ে আসা প্রত্যেক মুমিনের জন্য একান্ত অপরিহার্য।

ইসলাম বরাবরই সামাজিক শিষ্টাচার ও আদবের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। কারণ, একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনে এই শিষ্টাচারগুলোই পালন করে মুখ্য ভূমিকা। সেইসাথে শিষ্টাচারের অনুশীলন পারস্পরিক সহমর্মিতা এবং বন্ধনও মজবুত করে। মানবিকতা বৃদ্ধি পায়। এগুলোর প্রতিপালনে সমাজের মধ্যেও মুসলিমরা অন্য সবার চেয়ে বেশি মার্জিত ও গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। তারপরও পরিতাপের বিষয়, বর্তমানে অনেক মুসলিম এই শিষ্টাচারগুলো সম্পর্কে বেখেয়াল। শুধু তা-ই নয়, এসব আদব ও সৌজন্যতার বিষয়ে সচেতনতার তীব্র অভাব পরিলক্ষিত হয়।

১.২ স্বতন্ত্র মুসলিম ব্যক্তিত্ব

মুসলিমদের ব্যক্তিত্ব গঠনে এবং সমাজে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় শিষ্টাচারগুলো অনুসরণ করার ব্যাপারে ইসলাম সব সময়ই গুরুত্ব প্রদান করেছে। কোনো সন্দেহ নেই, কেউ যদি সঠিকভাবে ইসলামের নির্দেশিত গুণাবলি ও অভ্যাসগুলোর চর্চা করে, তাহলে এর মাধ্যমে তার যোগ্যতা অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়, ব্যক্তিত্বের মাত্রা বিশুদ্ধ হয় এবং সর্বোপরি সে অন্যান্য মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিতেও সক্ষম হয়।

এখানে যে শিষ্টাচারমালা তুলে ধরা হচ্ছে, তা দ্বীনি আচরণের সঙ্গে খুবই প্রাসঙ্গিক। সেইসাথে এই অভ্যাসগুলোর চর্চা দ্বীনের উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। যদি আমরা এ বিষয়গুলোকে শিষ্টাচার হিসেবে অভিহিত করি, তবে কেউ কেউ তা নিছক সামাজিকতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবেও গণ্য করতে পারে; যা পুরোপুরি সঠিক হবে না। হয়তো কেউ কেউ এই বিষয়গুলোকে ততটা গুরুত্ব দেবে না কিংবা মনে করবে, এগুলো অগ্রাহ্য করারও সুযোগ আছে। কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা তা নয়। এগুলো কোনো বিকল্প হিসেবে নয়; বরং ইসলামকে সঠিকভাবে ধারণ করার জন্যই একজন মুসলিমকে এই অভ্যাস ও শিষ্টাচারগুলোর অনুশীলন করতে হবে।

শিষ্টাচারকে শরিয়তের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এটি এমন কোনো বিষয় নয় যে ইচ্ছে হলে মানবে কিংবা অগ্রাহ্য করবে। অনেকক্ষেত্রে এই আচারাদি ও শিষ্টাচারগুলো আমলের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। ইমাম কাররাফি রহ.[২] তাঁর *আল ফুরুক* গ্রন্থে বলেছেন, "তোমরা জেনে রাখো, অনেক সময় খুব সামান্য একটি শিষ্টাচারও অনেকগুলো ভালো কাজের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।"

রুয়াইম নামক এক সজ্জন ব্যক্তি তার সন্তানকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, "ও আমার প্রিয় সন্তান! তুমি নিজের আমলকে লবণ মনে করো, আর শিষ্টাচারকে মনে করো আটা।" অর্থাৎ রুটি বানাতে যেমন অনেক পরিমাণে আটা আর অল্প একটু লবণ লাগে, তিনিও নিজের সন্তানকে একই অনুপাতে শিষ্টাচারের অভ্যাস করার তাগিদ দিয়েছেন।

কারও যদি শিষ্টাচারের মাত্রা কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে হয়, তাহলে আমলের মাত্রা কিছু কম হলেও পুষিয়ে যায়। কিন্তু কারও আমল হয়তো বেশি, তবে আদব বা ব্যবহার ভালো নয়, সেক্ষেত্রে আমল তেমন বেশি ইতিবাচক ফল নিয়ে আসবে না। যদিও অধিকাংশ আদব-শিষ্টাচার নিছক সৌজন্যতার খাতিরে করতে হয়, তারপরও এগুলোর আলাদা গুরুত্ব আছে। আমাদের মধ্যে এমন অনেক মুসলিম রয়েছে, যাদের নানা ধরনের ভুল, অসুন্দর ও অন্যায় আচরণের কারণে পুরো ইসলামের ভাবমর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়।

রাসূল সা. সাহাবিদের উদ্দেশ্য করে প্রায়ই বলতেন, "তোমরা যখন তোমাদের কোনো ভাইয়ের সাথে দেখা করতে যাবে, তখন ভালো ও মার্জিত পোশাক পরে যাও। যাতে করে তোমাকে যারা যাত্রাপথে দেখবে, তাদের মনে যেন তোমার ব্যাপারে ভালো ধারণা তৈরি হয়। আল্লাহ তায়ালা উদ্‌ভ্রান্ত মানুষ এবং এলোমেলো পোশাক পছন্দ করেন না।" *আবু দাউদ : ৪০৮৯*

রাসূল সা. আরও বলেন, "কারও মনে এক ফোঁটা ঔদ্ধত্যভাব বা অহংকার থাকলে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।" তখন এক সাহাবি জানতে চাইলেন, 'তাহলে একজন মানুষ কি সুন্দর কোনো পোশাক বা সুন্দর জুতো পরতে পারবে না? কেননা, এগুলো পরিধান করার ফলেও তো কারও মনে অহংকার সৃষ্টি হতে পারে।' তখন রাসূল সা. উত্তর দিলেন, "সুন্দর পোশাকে

---

২. ইমাম কাররাফি রহ. মালেকি মাযহাবের অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর আসল নাম শিহাব উদ্দিন কাররাফি। *আল ফুরুক* (পার্থক্য) তাঁর বিখ্যাত একটি গ্রন্থ।

কোনো সমস্যা নেই। কেননা, আল্লাহ তায়ালা নিজে সুন্দর, তাই তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। অহংকার ও ঔদ্ধত্য মানসিকতা তখন আসে, যখন আমরা অন্যের অধিকারকে অগ্রাহ্য করি এবং মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করি।" *সহিহ মুসলিম : ১৪৭, ১৬৮*

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, "আল্লাহ সুন্দর সবকিছুকেই পছন্দ করেন, এমনকি সুন্দর পোশাকও তাঁর পছন্দ।"[৩] সুতরাং একজন আদর্শ মুসলিমের সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করা উচিত। আরও উচিত, এমনভাবে মানুষের সামনে উপস্থিত হওয়া, যাতে তাকে দেখে অন্য সবার মনে ইতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হয়।

কাপড় পরার ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে, যেন বেশি আটোসাটো পোশাক পরা না হয়। কারণ, এতে শরীরের অবয়ব দৃশ্যমান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ সা. দুইভাবে কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন। ১. পোশাক এমনভাবে লেপ্টে পরা যে, লজ্জাস্থান আকাশের দিকে উন্মুক্ত হয়ে থাকে, ২. পোশাক এমনভাবে পরা যে, শরীরের একদিক বের হয়ে থাকে, আর অবশিষ্ট অংশ কাঁধে ফেলে রাখা হয়।" *আবু দাউদ : ৪০৮০*

---

৩. ইবনে তাইমিয়া, *ইকতিদা সিরাতিল মুসতাকিম*

প্রাথমিক কিছু আদব

২.১ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও শালীনতা

সহিহ বুখারিতে উদ্ধৃত একটি হাদিস। সালমান ফারসি রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সা. বলেছেন, "যে ব্যক্তি জুমাবার গোসল করে, নিজেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে এবং শরীরে সুগন্ধি মেখে নামাজের উদ্দেশ্যে বের হয়। তার দুই ভাই ও বন্ধুর মাঝে দূরত্ব ঘোচানোর চেষ্টা করে। তারপর সাধ্যমতো নামাজ পড়ে এবং মনোযোগ দিয়ে খুতবা শ্রবণ করে, তার বিগত এক সপ্তাহের গুনাহগুলোকে মাফ করে দেওয়া হয়।" *বুখারি : ৮৮৩*

যদি কারও শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হয়, তবে জুমাবার আসার দু-এক দিন আগেও প্রয়োজনে নিজেকে পরিচ্ছন্ন করে নেবে। আর যখনই গোসল করার প্রয়োজন পড়বে, তখনই তা করা উচিত।

বিশেষত জুমাবারে বেশি পানি দিয়ে গোসলের কথা বলা হয়েছে। কারণ, সেদিন জুমার সালাত আদায় করতে হয়। আর জুমার নামাজে মসজিদগুলোতে অন্য যেকোনো ওয়াক্তের নামাজের তুলনায় অনেক বেশি মুসল্লি সমবেত হয়। যদি গোসল করার পরও কারও শরীর নোংরা হয় বা মাত্রাতিরিক্ত ঘামের কারণে দুর্গন্ধ বের হয়, তাহলে সন্ধ্যা বেলায় বা পরদিন ভোরে আবার গোসল করবে।

সহিহ বুখারি ও মুসলিমে উদ্ধৃত একটি হাদিস এখানে উল্লেখ করা যায়। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, "প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার মাথা ও শরীর বিশেষভাবে ধোয়া প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব।" *বুখারি : ৮৫৬, মুসলিম : ৮৪৯*

আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, "নবি করিম সা. যখন গোসল করতেন, তখন প্রথমে হাত দুটো ধুয়ে নিতেন। তারপর সালাতের অজুর মতো অজু করতেন। আঙুল পানিতে ডুবিয়ে নিয়ে চুলের গোড়া খিলাল করতেন। অতঃপর উভয় হাতের তিন আঁজলা পানি মাথায় ঢালতেন। তারপর সারা দেহের ওপর পানি ঢালতেন।" *আহমাদ : ২৫৭০৪*

২.২ সফরে যাওয়ার আদব

কেউ যখন সফরের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বিদায় নেবে, তখন তার উচিত নিজের অভিভাবক, মা-বাবা, স্ত্রী, পরিবার-পরিজন এবং দ্বীনি ভাইদের থেকে বিদায় নেওয়া। বর্তমান সময়ে আমরা সফরটাকে খুব গতানুগতিক যাত্রা বানিয়ে ফেলেছি। কিন্তু সফরে বের হওয়ার ক্ষেত্রেও কিছু আদব মানা জরুরি। ইবনে আবদিল বার রহ. তাগিদ দিয়েছেন সফরে বের হওয়ার আগে সবাইকে যথাযথভাবে অবহিত করা এবং দুআ করে ঘর থেকে বের হওয়ার জন্য।

এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নাহও আছে; যদিও এই চর্চাটি এখন আর সেভাবে দেখা যায় না। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “রাসূল সা. কোনো লোককে বিদায় দেওয়ার সময় তার হাত ধরতেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের হাত না ছাড়াতো, তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত ধরে থাকতেন। তিনি বলতেন, ‘তোমার দ্বীন, ঈমান ও সর্বশেষ আমলের ব্যাপারটি আল্লাহ তায়ালার আমানতে রাখলাম’।” *আবু দাউদ : ২৬০০, তিরমিযি : ৩৪৪২, ইবনে মাজাহ : ২৮২৬*

সাম্প্রতিক সময়ে গ্রুপ ট্যুরের পরিমাণ খুব বৃদ্ধি পেয়েছে। দলবেঁধে অনেকেই নানা জায়গায় বেড়াতে যায়। এই সফরগুলোতে কারও কথা মানা না মানা নিয়ে অনেক সময় দ্বন্দ্ব হয়। এ কারণে নানান সমস্যাও তৈরি হয়। অথচ হাদিসে যেকোনো সফর শুরু করার আগেই নেতৃত্ব নির্ধারণ করে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আবু সাঈদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, “তিন ব্যক্তি একত্রে সফর করলে তারা যেন নিজেদের মধ্য হতে একজনকে আমির বানিয়ে নেয়।” *আবু দাউদ : ২৬০৮*

মহিলাদের জন্য একাকী সফরে বের হওয়াকে ইসলাম অনুমোদন দেয়নি। মহিলাদের মাহরাম সাথে নিয়েই সফরে বের হতে হবে। মাহরাম বলতে স্বামী, পিতা বা ভাই কিংবা এমন নিকটাত্মীয় যাদের সাথে বিয়ে হারাম। মাহরাম ছাড়া সফরে বের হলে মহিলারা যাত্রাপথে পরপুরুষ দ্বারা বিপদে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল। মূলত এই বাস্তবতা থেকেই হাদিসে মাহরাম নিয়ে সফরে বের হওয়ার জন্য নারীদের প্রতি তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, “যে মহিলা আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর ঈমান রাখে, সঙ্গে কোনো মাহরাম পুরুষ ব্যতীত তার জন্য এক দিনের পরিমাণ দূরত্বের পথ সফর করা বৈধ নয়।” *বুখারি : ১০৮৮, মুসলিম : ১৩৩৯*

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদিসে রাসূল সা. বলেছেন, "কোনো পুরুষের জন্য যেমন একাকী সফর করা নিরাপদ নয়, ঠিক তেমনি মহিলাদের জন্যও মাহরাম ছাড়া সফরে বের হওয়া উচিত নয়।" এই কথা শোনার পর এক বেদুইন নবি সা.-এর কাছে এসে বলল, 'অমুক অমুক যুদ্ধে যোগদানের জন্য আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে আর অন্যদিকে আমার স্ত্রী হজে যাওয়ার সংকল্প করেছে। এখন আমি কী করব?' রাসূল সা. বলেন, 'তুমি ফিরে গিয়ে তোমার স্ত্রীর সাথে হজে যাও।' *বুখারি : ১৮৬২, মুসলিম : ১৩৪১*

যাত্রা শুরু করার সময় আমরা বলব,

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُون

"মহান পবিত্র তিনি, যিনি এ বাহনকে আমাদের অধীন করে দিয়েছেন; নতুবা আমরা তো এটাকে বশ করতে সক্ষম ছিলাম না। একদিন আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের রবের কাছে ফিরে যেতে হবে।" *সূরা যুখরুফ : ১৩-১৪*

রাসূল সা. কোনো প্রাণী সওয়ারিতে বসার সময় এই দুআ পড়তেন। তাই উপরোক্ত দুআটি সওয়ারির ওপর আরোহণ এবং যান্ত্রিক যানবাহনে যাতায়াতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মুমিনের উচিত সফরের সময় পরকালীন কঠিন সফরের (মৃত্যু) কথা স্মরণ করা; যা অবশ্যই সংঘটিত হবে।

যানবাহনে আরোহণের সময় প্রাসঙ্গিক সুন্নাত :

ক. যানবাহনে উঠার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলে পা রাখা। *(তিরমিযি)*

খ. যানবাহনে উঠার পর স্থির হলে বা বসার পর 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা, তারপর উপরোল্লিখিত আরোহণের দুআটি পড়া। *(তিরমিযি)*

গ. দুআ পড়ার পর তিনবার 'আলহামদুলিল্লাহ' এবং তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলা। *(তিরমিযি)*

২.৩ সফর থেকে ফেরার আদব

যদি আপনি কারও সাক্ষাতে যান কিংবা কেউ যদি আপনার কাছে বেড়াতে আসে– সে যেই হোক না কেন, হতে পারে আপনার পিতা-মাতা বা কোনো আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব অথবা ভিন্ন বয়সের কেউ, তা হলে তার সাথে সাক্ষাতের আগে হাত, পা এবং পায়ের মোজা পরিষ্কার করুন। পরিধেয় পোশাক পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করুন। নিজের বাহ্যিক অবয়ব ও পোশাক নিয়ে কখনও অবহেলা

করবেন না। এই বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিলে আপনার অভিজ্ঞতা ভালো না-ও হতে পারে। সেক্ষেত্রে সাক্ষাতের ফলে আপনি যে স্বস্তি প্রত্যাশা করেছিলেন, তা থেকেও বঞ্চিত হবেন।

এ কারণে যখনই কোনো সাহাবি সফর থেকে নিজ শহরে ফিরতেন, রাসূল সা. বলতেন, "তোমরা তোমাদের নিজ গৃহে ফিরছ। তাই সুন্দর পোশাক পরে নাও। নিজের বাহনটিতে ভালোভাবে বসো। যাতে তোমাকে দেখে স্থানীয় মানুষের মাঝে সুধারণার সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তায়ালা অগোছালো কোনো কিছুকে পছন্দ করেন না।"

কোথাও যাওয়ার আগে কিছু উপহারসামগ্রী নিতে পারেন। আবার কেউ আপনার বাড়ি বা কর্মস্থলে হাজির হলে কিংবা সাক্ষাৎ করতে এলে তাদেরও কিছু উপহার দিতে পারেন। আমাদের পূর্বসূরিরা কারও বাড়িতে মেহমান হলে ফিরে যাওয়ার সময় কৃতজ্ঞতাস্বরূপ উপহার দিতেন।

মানুষের সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয়টি এমনিতেই বেশ উপভোগ্য ও স্মরণীয়। তার ওপর যদি কাউকে উপহার দেওয়া যায়, যদিও বিষয়টা নিতান্তই প্রতীকী; কিন্তু তারপরও তা সাক্ষাতের আনন্দ অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয়। ইমাম বুখারি রহ.-এর সংকলিত হাদিস, রাসূল সা. বলেছেন, "তোমরা একে অপরকে উপহার দাও, এর মাধ্যমে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়।" *আদাবুল মুফরাদ : ৫৯৪*

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেন, "রাসূল সা. সফরে থাকা পুরুষদের পরিবারকে আগে থেকে না জানিয়ে হঠাৎ করে বাড়িতে ফিরতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি রাতে ফিরে আসো, তা হলে সে যেন কোনো বার্তা না দিয়ে ঘরের ভেতর প্রবেশ না করে। কারণ, স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রী লোকেরা একটু খোলামেলা থাকতে পারে। অথবা এমন কোনো অবস্থায় থাকতে পারে, যেভাবে সে নিজেকে স্বামীর সামনে উপস্থাপন করতে চায় না।" *বুখারি : ১৮০১, মুসলিম : ৭১৫*

ইমাম নববি রহ. এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, "যদি কারও স্বামী দীর্ঘ সময় বাইরে থাকার পর বাড়ি ফিরে আসে, তবে তার জন্য পূর্ব সংবাদ না দিয়ে ঘরে প্রবেশ করা উচিত নয়। তবে যদি কেউ স্বল্প সময়ের জন্য সফরে যায় এবং রাতে ফিরে আসার কথা থাকে, তবে তার জন্য রাতে ঘরে ফিরতে তেমন অসুবিধা নেই।"

২.৪ পরিবার ও বন্ধুদের সামনেও ভালো পোশাক পরিধান করা

আমরা অনেক সময় বাড়িতে, পরিবারের সদস্য বা বন্ধুদের সামনে থাকা অবস্থায় পোশাক নিয়ে অবহেলা করি। এমনটা করা শোভন নয়। বরং সর্বদা শালীনভাবে পোশাক পরিধান করা উচিত। যখন বাবা-মার সামনে যাব অথবা ধার্মিক কোনো ব্যক্তি, কোনো মুরব্বি কিংবা আত্মীয়ের কাছে, তখন মার্জিত পোশাক পরাই সুন্দর। আমাদের পোশাকগুলো সব সময়ই পরিষ্কার, পাক-পবিত্র হওয়া উচিত। দেখতে অশালীন দেখায়– এমন কোনো পোশাক পরিধান করা কখনোই কাম্য নয়।

আমরা প্রথমত চোখের দৃষ্টিতে দেখেই কারও প্রতি আকৃষ্ট হই। যদি আপনাকে পাক-পবিত্র পোশাকে দেখতে ভালো দেখায়, আপনার পোশাক থেকে যদি সুগন্ধ নির্গত হয়, তা হলে আপনার উপস্থিতি অন্যদের মাঝে ইতিবাচক অনুভূতি সৃষ্টি করবে। এর বিপরীত হলে মানুষ আপনাকে অবজ্ঞা করবে এবং আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। কেউ আপনার সাক্ষাতে এলে কিংবা কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে মার্জিত পোশাক পরিধান করা ইসলামি শিষ্টাচারের আওতাভুক্ত। তাই এই বিষয়টিকে অবহেলা করার সুযোগ নেই।

ইমাম আনাস বিন মালিক রহ.-এর ছাত্র সাবিত আল বানানি বলেন, “আমি যখনই আমার শিক্ষক আনাসের সাথে সাক্ষাৎ করতে যেতাম, দেখতাম তিনি কাউকে ডেকে আতর দিয়ে যেতে বলতেন এবং সেই আতর নিজের গলা ও ঘাড়ে লাগাতেন।”

আপনি বাড়িতে থাকা অবস্থায় খুব সাদামাটা পোশাক পরিধান করতে পারেন। তবে মেহমান এলে অবশ্যই উত্তম পোশাক পরিধান করা উচিত। তা হলে তিনি বুঝবেন, আপনি তার জন্য ভালো পোশাক পরেছেন। এতে আপনার প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধ বাড়বে। তিনি আপনার আতিথেয়তার প্রশংসা করবেন। আর সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, ইসলামের প্রথম যুগের মুসলিমরা এই শিষ্টাচারগুলো ব্যাপকভাবে অনুশীলন করতেন, যা বর্তমানে অনেকটাই কমে এসেছে।

পোশাকের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি মেনে চলা দরকার তা হলো, একজন পুরুষের কোনোভাবেই মেয়েদের মতো পোশাক পরিধান করা উচিত নয়। আবার মেয়েদেরও ছেলেদের পোশাক নকল করার সুযোগ নেই। রাসূল সা. এই ধরনের চর্চাকারীদের অভিশাপ দিয়ে গেছেন। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, “যেসব নারী পুরুষের বেশ ধারণ করে এবং যেসব পুরুষ নারীদের বেশ ধারণ করে, রাসূলুল্লাহ সা. তাদের অভিসম্পাত করেছেন।” *বুখারি : ৫৮৮৫, ৫৮৮৬*

কারও যদি সম্পদ বেশি থাকে, অর্থাৎ আল্লাহ যদি কাউকে দুনিয়াতে অধিক সম্পদের নিয়ামত দেন, তা হলে তার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কোনোভাবেই পোশাকে সেই সম্পদের অহংকার প্রকাশিত হওয়া উচিত নয়। অহংকার থাকলে সেই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আবার কাউকে আল্লাহ নিয়ামত দিয়েছেন অথচ সে বৈরাগীর মতো জীবনযাপন করবে, পোশাকের মানের দিকে ন্যূনতম খেয়ালও রাখবে না– এমনটা কাম্য নয়। অতি ঝকমকে পোশাক বা ময়লা ও ছেঁড়া পোশাক, দুটোই পরিহার করা বাঞ্ছনীয়।

আবুল আহ্ওয়াস রহ. হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, "একদা আমি খুব স্বল্প মূল্যের পোশাক পরে নবিজি সা.-এর সামনে উপস্থিত হলে তিনি বললেন, 'তোমার ধন-সম্পদ আছে কি?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কোন ধরনের সম্পদ?' আমি বললাম, 'আল্লাহ আমাকে উট, ছাগল, ঘোড়া ও দাস ইত্যাদি সম্পদ দিয়েছেন।' রাসূল সা. বললেন, 'যেহেতু আল্লাহ তোমাকে সম্পদশালী করেছেন, কাজেই আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহের নিদর্শন তোমার মাঝে প্রকাশিত হওয়া উচিত'।" *আবু দাউদ : ৪০৬৩*

অনেকেই আছেন যারা সমাজের মধ্যে একটু ব্যতিক্রম হওয়ার জন্য কিংবা দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য অথবা পরিচিত, খ্যাতিমান ও আলোচিত হওয়ার উদ্দেশ্যে অদ্ভুত ধরনের সব পোশাক পরে। রাসূল সা. এই ধরনের ঠাটবাট দেখাতে নিষেধ করেছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন, "যে ব্যক্তি খ্যাতি লাভের জন্য পোশাক পরে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সেরূপ পোশাক পরাবেন, অতঃপর তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হবে।" *আহমাদ : ৫৬৩১, আবু দাউদ : ৪০২৯*

ঘরে প্রবেশ ও ঘর থেকে বের হওয়া প্রসঙ্গে

৩.১ কীভাবে ঘরে প্রবেশ করবেন

ঘরে প্রবেশ করা কিংবা ঘর থেকে বের হওয়ার সময় ডান পা আগে ফেলতে হবে, নবিজি সা. তা-ই করতেন। প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ ইমাম আবুল আলা হাসান ইবনে আহমাদ আল হামদানি রহ. এই সুন্নাতটি অনুসরণে এতটাই তৎপর ছিলেন যে, কেউ যদি তাঁর ঘরে বাম পায়ে প্রবেশ করত, তিনি তাকে বাইরে গিয়ে পুনরায় ডান পায়ে প্রবেশ করার অনুরোধ করতেন।

তৎকালীন সুলতানও নিয়মিত ইমামের পরিচালনাধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতে যেতেন এবং তাঁর সামনে ছাত্রের মতো বিনয়ী হয়ে আসন গ্রহণ করতেন। ইমাম হামদানি রহ. সুলতানকেও ঘরে প্রবেশ এবং বের হওয়ার সময় ডান পা আগে ফেলতে বলতেন। সেই সাথে, তিনি সুলতানসহ সকল মানুষকে রাস্তার ডান পাশ দিয়ে হাঁটার জন্যও উপদেশ দিতেন।

ঘরে প্রবেশ করা বা বের হওয়ার সময় শব্দ করে দরজা বন্ধ করা ঠিক নয়। এমন কিছু দরজা রয়েছে, যেগুলো বন্ধ হওয়ার সময় বিরক্তিকর শব্দ হয়। এ ধরনের আওয়াজ বন্ধের জন্যও ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। সামান্য দরজা বন্ধ করার মাঝেও ইসলামি আদবের প্রতিফলন ঘটানো সম্ভব। হাত দিয়ে খুব ধীরে শব্দ না করে দরজা বন্ধ করতে হবে। উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, "আদব ও সৌজন্যতা প্রতিটি কাজকেই মহিমান্বিত করে। আর যখন কোনো কাজে আদব থাকে না, তখন সেই কাজটি নষ্ট হয়ে যায়।" *আহমাদ : ২৪৪১৭*

৩.২ যখন সবাই ঘুমিয়ে থাকে, তখন কীভাবে ঘরে প্রবেশ করবেন

যদি এমন কোনো স্থানে প্রবেশ করেন, যেখানে অন্য সবাই ঘুমিয়ে আছে, তা হলে প্রবেশের আগে শান্ত ও মার্জিত হওয়ার চেষ্টা করুন। অন্যের কষ্ট নিয়ে ভাবুন। কারও জন্য ঝামেলা তৈরি করবেন না। ঘরে প্রবেশ বা ঘর থেকে বের

হওয়ার সময় অযাচিত শোরগোল করবেন না। রাসূল সা. বলেছেন, "যার ভেতরে ভদ্রতা ও মার্জিতভাব নেই, তার ভেতর সততাও থাকতে পারে না।" *মুসলিম : ২৫৯২*

মুসলিম ও তিরমিযিতে প্রখ্যাত সাহাবি মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ রা. থেকে বর্ণনাকৃত হাদিসে জানা যায়, "আমরা পান করার পর রাসূল সা.-এর প্রাপ্য দুধের কিছু অংশ রেখে দিতাম। রাসূল সা. যখন রাতের বেলায় সেই দুধটুকু সংগ্রহ করতে আসতেন, তিনি খুব হালকা শব্দ করতেন। আমরা যারা জেগে থাকতাম শুধু তারাই সেই শব্দ শুনতে পারতাম। তিনি কখনোই এতটা আওয়াজ করতেন না, যাতে ঘুমন্ত মানুষগুলোর অসুবিধা হয়। এমনকি গভীর রাতে রাসূল সা. যখন নামাজ পড়তেন, তখনও তিনি এতটাই মোলায়েম স্বরে নামাজ পড়তেন যে, যারা জেগে আছে তাদের কাছে ভালো লাগত। কিন্তু যারা ঘুমিয়ে আছে, তারা কিছুই বুঝতে পারতো না।" মুসলিম : ৫২৫৭

রাজকুমারী কাতরুন নাদা তার বুদ্ধিমত্তা, শিষ্টাচার এবং সৌন্দর্যের জন্য ব্যাপক পরিচিত ছিলেন। তিনি মিশরের গভর্নর খুমারুউয়াহ বিন আহমাদ বিন তোওলনের মেয়ে। পরে তিনি আব্বাসীয় খলিফা আল মুতাদিদ বিল্লাহর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। কাতরুন নাদা বলেন, "আমার বাবা আমাকে একটি উন্নত শিষ্টাচার শিখিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন, 'যদি দেখো, সবাই বসে আছে, তবে তার মাঝে তুমি ঘুমিও না। আবার সবাই যেখানে ঘুমিয়ে আছে, তুমি সেখানে অহেতুক বসে থেকো না'।"

৩.৩ অভিবাদন বা সম্ভাষণ

যখন ঘরে প্রবেশ করবেন বা বের হবেন, তখন বাড়ির ভেতরের লোকদের আগে নিজের অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করুন। প্রতিবার ঘরে প্রবেশ করা বা বের হওয়ার সময় শব্দ করে বলুন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ- আপনাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। মুসলিম হিসেবে আমাদের এই কথাটিই ব্যবহার করা উচিত। 'গুড মর্নিং' বা 'শুভ সকাল' কিংবা 'হ্যালো' বলে কাউকে অভিবাদন না জানানোই ভালো। 'আসসালামু আলাইকুম' কথাটাই মুসলিমদের সঠিক নিদর্শন। রাসূল সা. তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহাবি আনাস বিন মালিক রা.-কে এ প্রসঙ্গে বলেন, "যখনই ঘরে ঢুকবে বা ঘর থেকে বের হবে, পরিবারের সবাইকে সালাম দেবে। কারণ, এর মাধ্যমে তুমি তোমার পরিবারের জন্য শান্তি, নিয়ামত ও বরকত কামনা করলে।" *তিরমিযি : ২৬৯৮*

প্রখ্যাত তাবেয়ি কাতাদা রহ. এই বিষয়ে বলেন, "তোমরা বাড়িতে প্রবেশ করার সময় পরিবারের সবাইকে উদ্দেশ্য করে সালাম দাও। তারাই তোমাদের সালাম পাওয়ার অধিক হকদার।"

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, "যখনই তোমরা কোনো অনুষ্ঠানে বা কিছু লোকের সমাগমস্থলে যাবে, তাদের সালাম দেবে। আবার যখন সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে, তখনও সালাম দেবে। প্রবেশ বা বের হওয়া উভয় ক্ষেত্রেই সালাম প্রদান করা সমান গুরুত্বপূর্ণ।" *আবু দাউদ*

রাবি ইবনে আমির রা. থেকে বর্ণিত, "একবার বনু আমিরের একজন লোক নবিজি সা.-এর সাথে দেখা করতে গেল। সে সরাসরি নবি সা.-এর ঘরে গিয়ে দরজার বাইরে থেকে ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইল। সেই মুহূর্তে রাসূল সা.-এর ঘরে একজন খাদেমও ছিল। রাসূল সা. খাদেমকে বললেন, তুমি বাইরে মেহমানের কাছে যাও এবং তাকে অনুমতি চাওয়ার নিয়ম শিখিয়ে দাও। সে যেন বলে, আসসালামু আলাইকুম। আমি কি ভেতরে আসতে পারি?" *আহমাদ : ২২৬১৭, আবু দাউদ : ৫১৭৭*

ইমাম সুয়ুতি রহ. *আযহারুল উরুশ ফি আখবারিল হাবুশ* গ্রন্থে আবু তালিব আল জুমাহি আত তাহইয়াতের একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, "প্রতিটি জাতির নিজস্ব অভিবাদন সংস্কৃতি রয়েছে। আরবরা বলে 'সালাম'। পারস্যের সম্রাটরা প্রত্যাশা করত, কেউ তাদের কাছে এলেই তাদের সামনে মাথা নত করবে, মাটিতে চুমু খাবে। পারস্যের লোকজন সেভাবেই রাজাকে অভিবাদন জানাত। আবিসিনিয়ানরা নিজেদের বুকের ওপর হাত রেখে অপরকে অভিবাদন জানাত। রোমানরা কারও সাথে দেখা হলেই মাথার কাপড় খুলে ফেলত। নুবিয়ানরা অতিথিদের চুমু দিয়ে এবং তাদের মুখে হাত রেখে স্বাগত জানাত। তবে ইসলাম আসার পর 'আসসালামু আলাইকুম' বলা ছাড়া অভিবাদন জানানোর অন্য সব রীতি পরিত্যক্ত হয়।"

ইমাম নববি রহ. *আল মাজমু* গ্রন্থে বলেন, "নিজের ঘর বা অন্যের ঘরে প্রবেশ করার আগে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' বলাটা উত্তম। আর কোনো ঘরে প্রবেশ করার সময় (তা খালি হোক কিংবা লোকে পরিপূর্ণ) সালাম দিয়েই প্রবেশ করতে হবে।"

বাইরে বের হওয়ার সময় দুআ করে বের হওয়া উত্তম। তিরমিযি ও আবু দাউদে খাদিমুর রাসূল আনাস রা.-এর সূত্রে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, "যদি তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে বের হও, অন্য কারও কাছে সাহায্য না চেয়ে কেবল

আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করো, তা হলে তোমরা সুরক্ষিত ও নিরাপদ। কারণ, তখন শয়তান তোমাদের ছেড়ে চলে যায় এবং আর কোনো ক্ষতি করতে পারে না।”

মুসলিম শরিফের আরেকটি হাদিসে, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সা. বলেছেন, “যদি তোমরা ঘরে প্রবেশ করার সময় এবং খাবার খাওয়ার আগে দুআ করো, তবে শয়তান তার সঙ্গীদের বলে, এখানে আজ ঘুমানো যাবে না, কোনো খাবারও পাওয়া যাবে না। কিন্তু তুমি যদি দুআ না করে প্রবেশ করো, তা হলে শয়তান তার সঙ্গীদের জানিয়ে দেয়, আজ এখানে খুব ভালোমতো ঘুমানো যাবে, অনেক খাবারও পাওয়া যাবে।”

৩.৪ নিজের উপস্থিতির জানান দেওয়া

বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করার আগে নিজের উপস্থিতি জানান দিন, যাতে বাড়ির ভেতরে থাকা লোকেরা আপনার উপস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হয়। হুট করে ঘরে ঢুকে কাউকে বিস্মিত করা বা ভয় দেখানো উচিত নয়। আমর ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেন, “আমার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. সব সময় একটু হালকা শব্দ করে বাড়ির সবাইকে নিজের উপস্থিতির কথা জানাতেন।”

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. বলেন, “যখন একজন ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশ করে, তখন তার উচিত গলায় একটু শব্দ করে বা কাশি দিয়ে কিংবা পায়ের জুতো দিয়ে আওয়াজ করে নিজের উপস্থিতির কথা জানানো।” ইমাম ইবনে হাম্বল রহ.-এর ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ বলেন, “মসজিদ থেকে বাবা যখনই বাড়িতে ফিরতেন, তখনই জুতো দিয়ে শব্দ করে বা কাশি দিয়ে নিজের উপস্থিতির কথা জানাতেন।”

বুখারি ও মুসলিম শরিফের হাদিস থেকে জানা যায়, যারা সফর শেষে গভীর রাতে হঠাৎ করে উপস্থিত হয়ে নিজের পরিবারের সদস্যদের অবাক করে দেয়, আল্লাহর রাসূল সা. তাদের তিরস্কার করেছেন। কারণ, এ ধরনের আচরণ বার বার করার ফলে পরিবারের সদস্যদের মনে সংশ্লিষ্ট সদস্যের ব্যাপারে অনাস্থা ও অবিশ্বাস তৈরি হতে পারে।

৩.৫ ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি নেওয়া

যদি বাড়ির সদস্যরা নিজেদের রুমে বিশ্রামরত অবস্থায় থাকে, আর যদি তখন ঘরে প্রবেশ করতে চান, তা হলে সবার আগে মৌখিকভাবে অনুমতি নিতে হবে

বা দরজায় কড়া নেড়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। তা না হলে এমন কোনো দৃশ্য দেখতে পারেন, যা উভয়ের জন্যই বিব্রতকর। নিজের পরিবার বা বর্ধিত পরিবার– সব ক্ষেত্রেই এই অভ্যাস অনুশীলন করা দরকার।

কুরআন মাজিদে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের ঘরে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে কিছু নিয়মকানুন মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন–

> "হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কারও ঘরে ততক্ষণ প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ তোমাদের মধ্যে কথা না হয় এবং ঘরের বাসিন্দাদের তোমরা সালাম না দাও। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম, যদি তোমরা স্মরণ রাখো। যদি তোমরা ঘরে কাউকে না পাও, তবে অনুমতি গ্রহণ না করা পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ করো না। যদি তোমাদের বলা হয় 'ফিরে যাও', তবে ফিরে যাবে। এতে তোমাদের জন্য আছে পবিত্রতা। আর তোমরা যা করো, আল্লাহ তা ভালোভাবে জানেন।"
> *সূরা নূর : ২৭-২৮*

মুয়াত্তায়ে মালিক গ্রন্থে এসেছে, "এক সাহাবি রাসূল সা.-এর কাছে প্রশ্ন করেন, 'আমি কি মায়ের ঘরে প্রবেশ করার আগেও অনুমতি চাইব?' নবিজি বলেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই।' তিনি বললেন, 'আমরা দুজন একই বাড়িতে থাকি।' রাসূল সা. বললেন, 'তারপরও অনুমতি চাইবে।' সাহাবি বললেন, 'কিন্তু আমি তো তাঁর সেবাও করি।' রাসূল সা. পুনরায় বললেন, 'তুমি কি তোমার মাকে বিব্রতকর কোনো অবস্থায় দেখা পছন্দ করবে?' এবার তিনি বললেন, 'না, তা কখনোই করব না।' তখন রাসূল সা. বললেন, 'তা হলে তার ঘরে প্রবেশ করার আগে অবশ্যই অনুমতি প্রার্থনা করবে'।" *মুয়াত্তা : ১৭৩৮*

অর্থাৎ, ঘরে যে কেউই থাকুক না কেন, অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা অনুচিত। অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করতে হবে। কারণ, যদি ঘরে কেউ থাকে, তবে তার পরিধেয় বস্ত্র যে সর্বদা ঠিকঠাক থাকবে, এমন কথা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তাই ঘরে প্রবেশ করার আগে অনুমতি গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-কে প্রশ্ন করল, 'আমি কি আমার মায়ের ঘরে প্রবেশ করার আগেও অনুমতি চাইব?' ইবনে মাসউদ রা. উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ! কারণ, কিছু সময় (অবস্থা) আছে, যখন তাকে দেখা তোমার জন্য শোভন হবে না।'

সাহাবি তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ রা.-এর সন্তান মুসা বলেন, “আমার পিতা একবার আমার মায়ের রুমে প্রবেশ করলেন। আমিও তাঁর সাথে সেই ঘরে প্রবেশ করলাম। আমার বাবা আমাকে থামিয়ে দিলেন এবং জোর করে বসিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, ‘তুমি তোমার মায়ের ঘরে অনুমতি না নিয়ে কীভাবে প্রবেশ করতে পারলে’?”

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর ছাত্র নাফি বলেন, “যখনই ইবনে উমর রা.-এর কোনো ছেলে সাবালক হতো, তার ঘর আলাদা করে দেওয়া হতো। ইবনে উমর তাঁর কোনো সন্তানকেই অনুমতি ব্যতীত ঘরে প্রবেশ করতে দিতেন না।”

তাবেয়ি আতা ইবনে আবি রাবাহ বর্ণনা করেন। তিনি একবার আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-কে প্রশ্ন করলেন, ‘আমি যখন আমার দুই বোনকে দেখতে যাব, তখনও কি অনুমতি চাইব?’ ইবনে আব্বাস রা. বললেন, ‘অবশ্যই।’ আতা বললেন, ‘কিন্তু আমি তো তাদের অভিভাবক। তাদের যাবতীয় ভরণ-পোষণের দায়িত্বও আমার।’ ইবনে আব্বাস এবার বললেন, ‘তুমি কি তাদের কোনো বিব্রতকর অবস্থায় দেখা ভালো মনে করো?’ তারপর তিনি কুরআনের সেই আয়াতটি পড়লেন, “তোমাদের সন্তান-সন্ততিরা যখন বয়োপ্রাপ্ত হয়, তারাও যেন তাদের পূর্ববর্তীদের মতো অনুমতি চায়। এমনিভাবে আল্লাহ তাঁর নিদর্শনসমূহ তোমাদের কাছে বর্ণনা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।” *সূরা নূর : ৫৯*

এই আয়াতটি তিলাওয়াত করে ইবনে আব্বাস রা. বললেন, “অনুমতি চাওয়া প্রত্যেকের জন্যই বাধ্যতামূলক।”

ইবনে মাসউদ রা. বলেন, “একজন মানুষকে অবশ্যই তার পিতামাতা, ভাই ও বোনের ঘরে প্রবেশের সময় অনুমতি নিতে হবে।”

জাবির রা. বলেন, “প্রত্যেকের উচিত তার নিজের ছেলে, মেয়ে, বয়স্ক মা, ভাই, বোন বা পিতার ঘরে প্রবেশের সময় অনুমতি চাওয়া।”

এমনকি নিজের স্ত্রীর ঘরে প্রবেশের সময়ও স্বামীর অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন। তা না হলে, এমন কোনো দৃশ্য স্বামীর চোখে পড়তে পারে, যা হয়তো তার ভালো লাগবে না। কিংবা এমন কোনো পরিস্থিতিতে তিনি স্ত্রীকে দেখে ফেলতে পারেন, যেভাবে হয়তো স্ত্রী নিজেকে উপস্থাপন করতে চায়নি।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর স্ত্রী যয়নাব রা. বলেন, “যখনই আমার স্বামী ইবনে মাসউদ ঘরের দরজার কাছে আসতেন, তিনি একটু শব্দ করতেন।

তিনি আমাদের বিস্মিত করতে ভয় পেতেন এবং বিব্রতকর কোনো পরিস্থিতি এড়িয়ে চলার সর্বোচ্চ চেষ্টা করতেন।" *তাফসিরে তাবারি ১৭/২৪৫; তাফসিরে ইবনে কাসির ৬/৪১-৪২*

ইমাম আহমাদ রহ. বলেন, "যখন কোনো স্বামী তার স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করতে চাইবে, তার উচিত অন্তত গলা খাকারি দিয়ে একটু শব্দ করা।" আবার এমনও হতে পারে, স্বামী একটু শব্দ করে নিজের জুতোগুলো সরাতে পারে, তা হলে স্ত্রী হয়তো নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার জন্য একটু সময় পাবে। যেহেতু বর্তমানে কলিংবেলের প্রচলন আছে, তাই বিষয়গুলো আগের তুলনায় অনেকটাই সহজ হয়ে গেছে।

অনুমতি ছাড়া কারও ঘরে প্রবেশ করা উচিত নয়। খাবার রান্না না হলে কারও ঘরে দাওয়াত নিয়ে তাকে বিব্রত করা উচিত নয়। কারও বাড়িতে রান্না হয়নি, অথচ অনেকেই আছে খাবার রান্না হওয়া পর্যন্ত বসেই থাকে এবং গোঁ ধরে বলে, আপনি রান্না করুন, আমরা খেয়ে যাব– এই ধরনের আচরণ কখনোই কাম্য নয়। আবার অনেককেই দেখা যায়, খাবার গ্রহণ শেষে অধিক কথা বলে সময় নষ্ট করে। ইসলামে এই ধরনের আচরণ অপছন্দনীয়। কুরআনে হাকিমে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেন,

> "হে মুমিনগণ! তোমাদের অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত খাবার রান্না সম্পন্ন হওয়ার অপেক্ষা না করে নবির ঘরে প্রবেশ করো না। তবে তোমাদের ভেতরে ডাকা হলে প্রবেশ করো, অতঃপর খাওয়া শেষে নিজ থেকেই চলে যেয়ো। কথাবার্তায় মশগুল হয়ে যেয়ো না। নিশ্চয় এটা নবির জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের কাছে সংকোচ বোধ করেন; কিন্তু আল্লাহ সত্য বলতে সংকোচ করেন না। সূরা আহযাব : ৫৩

৩.৬ দরজায় কড়া নাড়া বা বেল বাজানো

কোনো বাড়িতে গিয়ে দরজায় কড়া নাড়তে কিংবা কলিংবেল বাজাতে হলে এমনভাবে কড়া নাড়ুন বা বেল বাজান, যা আপনার উপস্থিতি জানান দিতে যথেষ্ট। খুব বাজেভাবে বা উচ্চৈঃস্বরে কড়া নাড়া কিংবা খুব আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়ে বেল বাজানো উচিত নয়। মনে রাখবেন, আপনি একজন অতিথি; কোনো সন্ত্রাসী বা অত্যাচারী নন যে বাড়ির ভেতর ঢুকে ঘর তছনছ করে সবাইকে আতঙ্কিত করবেন। তাই আপনার আচরণেও সে ধরনের উত্তেজিত মানসিকতা থাকা উচিত নয়।

একবার এক মহিলা একটি বিষয়ে মতামত জানার জন্য ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর বাড়িতে গেলেন। মহিলা ঘরে ঢোকার আগে খুব জোরে দরজায় করাঘাত করলেন। ইবনে হাম্বল রহ. বের হয়ে বললেন, "এভাবে পুলিশেরা কড়া নাড়ায়! তাই এভাবে করবেন না।"

ইমাম বুখারি রহ. *আদাবুল মুফরাদ* গ্রন্থে বলেন, "সাহাবিরা রাসূল সা.-এর দরজায় নক করার সময় খুব মৃদু আওয়াজ করে কড়া নাড়তেন।"

যে বাড়িতে বসার বা থাকার ঘরগুলো দরজার কাছেই, সেখানে হালকাভাবে দরজায় কড়া নাড়াই যথেষ্ট। কিন্তু যদি কোনো বাড়িতে বসার ঘরগুলো সদর দরজা থেকে অনেক দূরে হয়, তা হলে একটু জোরে কড়া নাড়া বা বেল বাজানো যাবে, যাতে ভেতরের লোকজন সেই শব্দ শুনতে পায়। কিন্তু তাই বলে কোনো অবস্থাতেই চেঁচামেচি করা উচিত নয়। মুসলিম শরিফের একটি হাদিস থেকে জানা যায়, রাসূল সা. বলেছেন, "যার ভেতরে কোমলতা নেই, তার অনেক কিছুই নেই।" আর চেঁচামেচি করা তো কোমলতারই বিপরীত।

দুবার কড়া নাড়ার জন্য বা দুবার বেল বাজানোর জন্য মাঝখানে কিছুটা সময় দেওয়া জরুরি। এমন হতে পারে, ভেতরে থাকা মানুষটি অজু করছে, অথবা নামাজরত অবস্থায় আছে কিংবা খাচ্ছে। তিনি যেন হাতের কাজ শেষ করে দরজা খুলতে পারেন, এতটুকু সময় দেওয়া উচিত। বিরতি কতটা লম্বা হতে পারে– তা নিয়ে আলিমদের মধ্যে নানা মত রয়েছে। অনেকেই মনে করেন, চার রাকাত নামাজ পড়তে যে সময় লাগে, সে পরিমাণ বিরতি দেওয়া যেতে পারে। কারণ, এমনও হতে পারে, বাড়ির ভেতরে থাকা মানুষটি দরজায় কড়া নাড়া বা বেল বাজানোর ঠিক আগেই নামাজ শুরু করেছেন। সেক্ষেত্রে তাকে নামাজ শেষ করার সুযোগ দেওয়া জরুরি।

এভাবে তিনবার কড়া নাড়া কিংবা বেল বাজানোর পরও যদি কেউ দরজা না খোলে তা হলে ধরে নিতে হবে, যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন তিনি ব্যস্ত আছেন। সেক্ষেত্রে চলে যাওয়াই শ্রেয়। রাসূল সা. বলেছেন, "যদি তিনবার অনুমতি চাওয়ার পরও ঘরে প্রবেশের সম্মতি না পাওয়া যায়, তা হলে তোমরা ফিরে যাবে।" *বুখারি : ৬২৪৫*

অনুমতির জন্য অপেক্ষারত অবস্থায় দরজার বরাবর সামনে দাঁড়ানো অনুচিত। একটু বামে বা ডানে গিয়ে দাঁড়ানো শ্রেয়। রাসূল সা. যখন কারও বাড়ির দরজার কাছে পৌঁছতেন, তিনি সরাসরি দরজার সামনে দাঁড়াতেন না। বরং ডানে বা বামে একটু পাশে সরে দাঁড়াতেন। *আবু দাউদ : ৫১৭৪*

যার বাড়ির দরজায় গিয়ে কড়া নাড়ছেন, তিনি যদি কোনো কারণে আপনাকে ফেরত যেতে বলেন, তা হলে আর বিলম্ব না করে ফিরে যাওয়াই উত্তম। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা এমন নির্দেশই দিয়েছেন।

> “যদি তোমাদের বলা হয় ‘ফিরে যাও’, তবে ফিরে যাবে। এতে তোমাদের জন্য আছে পবিত্রতা। তোমরা যা করো, আল্লাহ তা ভালোভাবে জানেন।” *সূরা নূর: ২৮*

৩.৭ ‘কে’ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রসঙ্গে

আপনি কারও দরজায় কড়া নাড়ার পর যদি ভেতর থেকে প্রশ্ন আসে, ‘কে?’ তা হলে নিজের পরিচয় দিন। এক্ষেত্রে নিজের নাম বলুন, যে নামে আপনাকে সবাই চেনে। অনেকেই বলে, ‘আমি’! আসলে এ ধরনের উত্তর দেওয়া ঠিক নয়। এ ধারণা না করাই ভালো যে, গলার আওয়াজ শুনেই ভেতরের মানুষরা চিনতে পারবে। আপনার গলার স্বর হয়তো অন্য কারও সাথে হুবহু বা কাছাকাছি মিল হতে পারে। তা ছাড়া সবাই কণ্ঠস্বর শুনে ব্যক্তির পরিচয় সনাক্ত করতে পারে না।

রাসূল সা. কারও দরজায় দাঁড়িয়ে ‘আমি, দরজা খোলো’ এই ধরনের কথা বলতে নিরুৎসাহিত করেছেন। কারণ, এ কথার মাধ্যমে পূর্ণ পরিচয় প্রকাশিত হয় না। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেন, “আমি একবার নবিজির কাছে গেলাম। তাঁর দরজায় কড়া নাড়ার পর তিনি ভেতর থেকে প্রশ্ন করলেন, ‘কে?’ আমি জবাবে বললাম, ‘আমি’। রাসূল সা. তখন ভেতর থেকে বললেন, ‘আমিও তো আমি। আমি মানে কে’?” *সহিহ বুখারি : ৬২৫০*

মূলত এ কারণে সাহাবিরা যখনই কারও বাড়িতে যেতেন, ভেতর থেকে পরিচয় জানতে চাইলেই নিজের নামটি বলতেন।

আরেকটি হাদিসে আবু জার গিফারি রা. বলেন, “আমি একবার রাতে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। একটু সামনে গিয়ে দেখতে পেলাম, রাসূল সা. নিজেও একা একা হাঁটছেন। আমি চাঁদের ছায়ার আড়ালে থেকেই তাঁর পেছনে হাঁটছিলাম। কিন্তু তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন, আমাকে দেখে ফেললেন এবং প্রশ্ন করলেন, ‘ওখানে কে?’ আমি উত্তর দিলাম, ‘আমি আবু জার’।” *বুখারি ও মুসলিম*

আলী রা.-এর বোন উম্মে হানি রা. বলেন, “আমি নবিজির সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। রাসূল সা. তখন গোসল করছিলেন, আর তাঁর মেয়ে ফাতিমা তাকে আড়াল করছিলেন। উম্মে হানি রা. কাছে পৌঁছানোর পর ফাতিমা রা. প্রশ্ন করলেন, ‘ওখানে কে?’ জবাব দিলাম, ‘আমি উম্মে হানি’।”

৩.৮ ঘর থেকে বের হওয়ার আদব

উম্মে সালামাহ রা. থেকে বর্ণিত, "রাসূল সা. যখনই আমার ঘর হতে বের হতেন, তখন আকাশের দিকে মাথা তুলে বলতেন, 'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে পথভ্রষ্ট হওয়া বা পথভ্রষ্ট করা, গুনাহ করা বা গুনাহের দিকে ধাবিত করা, উৎপীড়ন করা বা উৎপীড়িত হওয়া, অজ্ঞতা প্রকাশ করা বা অজ্ঞতা প্রকাশের পাত্র হওয়া হতে আশ্রয় চাইছি'।" *আবু দাউদ, কিতাবুল আদব : ৫০৯৪*

আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, "যখন কোনো ব্যক্তি তার ঘর হতে বের হওয়ার সময় বলবে, بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ তখন তাকে বলা হয়, 'তুমি হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছ, রক্ষা পেয়েছ ও নিরাপত্তা লাভ করেছ।' সুতরাং শয়তানরা তার থেকে দূর হয়ে যায় এবং এক শয়তান অন্য শয়তানকে বলে, তুমি ওই ব্যক্তিকে কী করতে পারবে যাকে পথ দেখানো হয়েছে, নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে এবং রক্ষা করা হয়েছে?" *আবু দাউদ : ৫০৯৫*

সাক্ষাতের আদব

৪.১ অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় ঠিক রাখা, দেরি ও সাক্ষাৎ বাতিল করা প্রসঙ্গে

কুরআনে হাকিমে সূরা মায়িদার প্রথম আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের সম্বোধন করে বলেছেন,

> "হে মুমিনগণ, তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করো।" *সূরা মায়িদা : ১*

আবার সূরা মারয়ামে নবি ইসমাইল আ.-কে একজন সত্যাশ্রয়ী এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী ব্যক্তি হিসেবে প্রশংসা করে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেন,

> "এই কিতাবে ইসমাইলের কথা বর্ণনা করুন, তিনি প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং তিনি ছিলেন রাসূল, নবি।" *সূরা মারয়াম : ৫৪*

সময় যেহেতু অত্যন্ত মূল্যবান, তাই কারও সাথে সাক্ষাতের জন্য সময় নিলে তা রক্ষা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একবার যদি নির্ধারিত সময় রক্ষা করা না যায়, তা হলে পুনরায় নতুন সময় নির্ধারণ করা খুব কঠিন হয়ে যায়। তাই যদি কারও সাথে সাক্ষাতের জন্য সময় নেন –হোক সে বন্ধু, সহকর্মী বা ব্যবসায়িক অংশীদার– তবে নির্ধারিত সময়েই দেখা করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। কারণ, একজন মানুষ নিজের জন্য বরাদ্দ সময় থেকে আপনাকে সময় দিচ্ছে। কিংবা এমনও হতে পারে, তিনি অন্য কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে আপনাকে সময় দিয়েছেন। তাই নির্ধারিত সময়ে সাক্ষাৎ করার বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। কারণ, নির্ধারিত সময় সাক্ষাৎ করতে ব্যর্থ হলে শুধু যে সময়ই নষ্ট হবে তা নয়; বরং আপনার ভাবমূর্তিও ক্ষুণ্ন হবে।

যদি সময়ের ব্যাপারে যত্নবান না হন, তা হলে আপনাকে কেউ-ই সম্মান করবে না। তাই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হোক বা কোনো ঘনিষ্ট বন্ধু হোক, যাকেই সময় দেবেন, তা রক্ষা করার ব্যাপারে সচেষ্ট হোন। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার মাধ্যমে ব্যক্তির দায়িত্ববোধের পরিচয়ও পাওয়া যায়।

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। একবার নবিজি সা. একজন ব্যক্তিকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সময় দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ের তিন দিন পর সাক্ষাতে এলো। রাসূল সা. তাকে খুব মৃদুভাবে সতর্ক করে বললেন, "তোমার জন্য আমার বেশ সমস্যা হয়ে গেল। আমি বিগত তিন দিন যাবৎ তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।" হয়তো সেই ব্যক্তির এরকম বিলম্ব হওয়ার পেছনে যৌক্তিক কারণও ছিল। কিন্তু তখনকার সময়ে এমন কোনো মাধ্যমও ছিল না, যার মাধ্যমে তিনি নবিজিকে নির্ধারিত সময়ে আসতে না পারার কথা জানাতে পারবেন।

বর্তমান সময়ে অতি দ্রুততার সাথে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করার নানা যন্ত্র ও মাধ্যম আবিষ্কার হয়েছে। তাই যখনই বুঝবেন, সাক্ষাতের নির্ধারিত সময় রক্ষা করতে পারবেন না, তখনই অপরপক্ষকে বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া উচিত। যাতে তারা সেই সময়টি অন্য কাজে লাগাতে পারে। দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ করবেন না। কখনও সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত সময়কে হালকা মনে করবেন না। নির্ধারিত সময়ে পৌঁছাতে না পারলে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নোটিশ দেবেন, প্রয়োজনে নিজের অপারগতার জন্য ক্ষমা চাইবেন। সাক্ষাৎ যার সঙ্গেই হোক না কেন, তা রক্ষা করা আপনার দায়িত্বের অংশ। তাই যদি নির্ধারিত সাক্ষাৎ বাতিল করতে হয়, তা হলে হাতে সময় রেখে শালীনতার সাথে আগে থেকে জানিয়ে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারবেন না বা যে প্রতিশ্রুতি রাখার ইচ্ছা নেই, তা না করাই ভালো। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা উচিত নয়। কারণ, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা মুনাফিকি ও প্রতারণার সমতুল্য। রাসূল সা. বলেছেন, "মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি। যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে। প্রতিশ্রুতি দিলে লঙ্ঘন করে। আর কেউ আমানত রাখলে তার খেয়ানত করে।" *বুখারি, মুসলিম*

ইমাম গাযালি রহ. *আল ইহইয়া* গ্রন্থে বলেছেন, "উপরোক্ত হাদিসটি তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যারা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে না জেনেও প্রতিশ্রুতি দেয় কিংবা যারা ওয়াদা করার পর কোনো কারণ ছাড়াই ওয়াদা পূরণ করে না।"

যারা প্রতিশ্রুতি দেয় কিন্তু যৌক্তিক কোনো ওজরের কারণে তা পালন করতে পারে না, তাতে মুনাফিকি হবে না। তারপরও আমরা সব সময় অত্যন্ত সতর্ক ও সচেতন থাকব, যাতে খোঁড়া অজুহাত দাঁড় করাতে না হয়। কারণ, আল্লাহ তায়ালা আমাদের অন্তরের প্রকৃত অবস্থা ও নিয়ত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

৪.২ নির্ধারিত কোনো সাক্ষাৎ যদি অপরপক্ষ মিস করে

যদি কোনো ব্যক্তি সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হতে না পেরে দুঃখ প্রকাশ করে, তা হলে অন্তরে রাগ বা কষ্ট পুষে না রেখে ক্ষমা করে দেওয়া উচিত। উপলব্ধি করা প্রয়োজন, নিশ্চয়ই তার এমন কোনো সমস্যা হয়েছে, যার কারণে সে উপস্থিত হতে পারেনি। হয়তো কোনো দাপ্তরিক বা পারিবারিক সমস্যা হয়েছে। এক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি ক্ষমা পাওয়ার হকদার।

প্রখ্যাত তাবেয়ি কাতাদা রহ. বলেন, "কেউ আপনার সাথে নির্ধারিত সময়ে সাক্ষাতে আসতে না পারলে, তার বাড়ির কাছে গিয়ে ঘুর ঘুর করার দরকার নেই। বরং তিনি সরলভাবে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা মেনে নিন। নিজের কাজে মনোযোগ দিন এবং তাকেও তার কাজে সচেষ্ট হওয়ার সুযোগ দিন। তার কাছে বার বার ব্যাখ্যা বা কারণ জানতে চাওয়ার দরকার নেই।"

ইমাম মালিক রহ. প্রায়শই বলতেন, "সব মানুষ কারণ ব্যাখ্যা করতে পছন্দ করে না। ইসলামের সোনালি যুগে, কেউ যদি নির্ধারিত সময়ে সাক্ষাতে আসতে না পারত, তবে অপরপক্ষ তা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করত না। বরং সরলভাবে নিজেই বলত, 'মনে হয় আপনি হঠাৎ করে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, তাই আসতে পারেননি। কোনো অসুবিধা নেই।' এভাবে পরিস্থিতিকে সহজ করে দেওয়ায় যিনি সাক্ষাৎ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তিনি বিব্রত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেতেন এবং তাকে আর নানা ধরনের কারণ বর্ণনা করতে হতো না।"

আমাদের এই অভ্যাসটির চর্চা করা দরকার। তা হলে মনের ভেতর থেকে যাবতীয় খারাপ অনুভূতি ও কুধারণার অবসান হবে এবং কেউ নির্ধারিত সময়ে সাক্ষাৎ করতে ব্যর্থ হলে কিংবা কিছুটা দেরি হলে অপরপক্ষের মনে কোনো কুচিন্তা আশ্রয় নেবে না।

এমন অনেকেই আছে যারা বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতির কারণে মেহমানকে বরণ করার মতো অবস্থায় থাকে না। বরং কেউ সাক্ষাতে এলে বিব্রত হয়, কিন্তু কীভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করবে তা বুঝতে পারে না। ফলে একটা পর্যায়ে তারা আর কোনো উপায় না পেয়ে মিথ্যা কথা বলতে শুরু করে। এটা ঠিক নয়। এতে বাড়িতে থাকা ছোটো ছোটো বাচ্চারা যেমন মিথ্যা বলার অভ্যাস শেখে, অন্যদিকে অতিথিদের ব্যাপারেও তাদের মনে বাজে ধারণা গেঁথে যায়।

এক্ষেত্রে কুরআন আমাদের বিব্রতকর পরিস্থিতি থেকে বাঁচার মতো কৌশল শিক্ষা দেয় এবং মিথ্যা কথা না বলার আদেশ দেয়। কুরআনে হাকিম বলছে,

যদি আয়োজক ব্যক্তির জন্য পরিস্থিতি সাক্ষাতের জন্য সহায়ক না হয়, তা হলে তিনি অতিথিকে বিনয়ের সাথে নিজের অপারগতার কথা জানিয়ে দেবেন। আবার একই সঙ্গে অতিথিকেও কুরআন আদেশ দেয়, যাতে তিনি এক্ষেত্রে কোনো ধরনের অস্বস্তি ছাড়াই অপরের অপরগতাকে সরলভাবে মেনে নেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> "যদি তোমরা কারও ঘরে কাউকে না পাও, তবে অনুমতি গ্রহণ না করা পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ করো না। যদি তোমাদের বলা হয় 'ফিরে যাও', তবে ফিরে যাবে। এতে তোমাদের জন্যে আছে অনেক পবিত্রতা।" *সূরা নূর : ২৮*

কুরআনের উল্লিখিত নির্দেশনা, "যদি তোমাদেরকে বলা হয় 'ফিরে যাও', তবে ফিরে যাবে। এতে তোমাদের জন্যে অনেক পবিত্রতা আছে।" চমৎকার ও ইতিবাচক একটি দৃষ্টিভঙ্গি।

৪.৩ নিজের চোখকে সংযত রাখা

যখন কারও দরজায় গিয়ে বেল দেবেন বা প্রবেশ করার অনুমতি চাইবেন, তখন উঁকিঝুঁকি মারা বা ভেতরের কোনো দৃশ্য দেখার চেষ্টা করবেন না। এ কাজ একই সঙ্গে লজ্জাজনক ও ক্ষতিকর।

বুখারি, *আবু দাউদ* ও *তাবারানি*-তে সাহাবি সাদ বিন উবাদা রা. থেকে বর্ণিত, "একবার এক লোক নবিজি সা.-এর বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে ঘরে ঢোকার অনুমতি চাইছিল। রাসূল সা. তখন তাকে বললেন, 'তুমি ঘুরে দাঁড়াও।' লোকটা ঘুরে দাঁড়ালে রাসূল সা. পুনরায় বললেন, 'তুমি দরজা থেকে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াও।' তারপর নবিজি সা. বললেন, 'অনুমতি চাওয়ার কথা বলা হয়েছে যাতে অযাচিত দৃষ্টি ও অনধিকার প্রবেশ থেকে অন্যের বাড়িঘরকে হেফাজত করা যায়'।"

ইমাম বুখারি রহ. *আদাবুল মুফরাদ* গ্রন্থে সাওবান রা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সা. বলেছেন, "অনুমতি পাওয়ার আগে অন্যের বাড়ির ভেতর দৃষ্টি দেওয়া উচিত নয়। কেননা, অযাচিত দৃষ্টি দেয়ার মানে হলো, অনুমতি পাওয়ার আগেই পরোক্ষভাবে ঘরে প্রবেশ করে ফেলা।"

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদিস *আদাবুল মুফরাদ*, *আবু দাউদ* ও *তিরমিযি*-তে উদ্ধৃত হয়েছে। রাসূল সা. বলেছেন, "যদি চোখের দৃষ্টি আগেই চলে যায়, তা হলে আর অনুমতি চাওয়ার বা দেওয়ার কোনো মানে হয় না।"

ইমাম বুখারির আরেকটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেছেন, "অনুমতি পাওয়ার আগেই অপরের ঘরের ভেতরে দৃষ্টি দেওয়া রীতিমতো অপরাধ।"

সাহাবি সাহল ইবনে সাদ রা. বর্ণনা করেছেন, "এক ব্যক্তি রাসূল সা.-এর ঘরের দেয়ালে ছোটো গর্ত দিয়ে উঁকি মেরে ভেতরে দেখার চেষ্টা করছিল। রাসূল সা. তাকে দেখে ফেললেন এবং বললেন, 'যদি আমি জানতাম তুমি এভাবে উঁকি দেবে তা হলে তোমার চোখে আঘাত করতাম। ভেতরে তাকানোর জন্য অনুমতি চাওয়ার বিধান তো দেওয়াই হয়েছে'।" *বুখারি : ৬২৪১*

৪.৪ জুতো সরিয়ে রাখা

কারও বাড়িতে যখন বেড়াতে যাবেন, এমনকি নিজের বাড়িতেও প্রবেশ বা বের হওয়ার সময় মার্জিত ও সৌজন্যমূলক আচরণ করুন। নিজের চোখ ও কণ্ঠস্বর সংযত রাখুন। যার বাড়িতে গিয়েছেন, যদি তিনি জুতো পরে ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দেন তা হলে ভিন্ন কথা, তা না হলে নিজ থেকেই জুতো খুলে ফেলুন এবং জুতো রাখার নির্ধারিত স্থানে রাখুন। ঘরে প্রবেশের সময় জুতো রাখা এবং বের হওয়ার সময় নেওয়ার ক্ষেত্রে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করুন। তাড়াহুড়ো করা থেকে বিরত থাকুন।

জুতো পরার সময় আগে ডান পায়ে পরুন। আর খোলার সময় বাম পায়ের জুতো আগে খুলবেন। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, "যখন তোমরা জুতো পরবে ডান পা দিয়ে তা শুরু করো। আর জুতো খোলার সময় বিপরীত, অর্থাৎ বাম পা আগে খুলো।" অর্থাৎ জুতো পরার সময় ডান পা আগে আর খোলার সময় ডান পা শেষে। *আবু দাউদ : ৪১৩৯*

উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রা. বর্ণনা করেন, "রাসূল সা. জুতো পরা, চুল আচড়ানো, পবিত্রতা অর্জন (অজু করা) ইত্যাদি ডান পাশ দিয়ে শুরু করা পছন্দ করতেন।" *বুখারি, মুসলিম*

নিজের বাড়িতে প্রবেশ করার সময়, জুতো কীভাবে রাখছেন তা লক্ষ করুন। যদি সেগুলো নোংরা হয় বা কোনো ময়লা লেগে থাকে, তা হলে সেগুলো পরিষ্কার করুন। মনে রাখবেন, ইসলাম হলো এমন একটি ধর্ম ও জীবনদর্শন, যা সর্বাবস্থায় পরিচ্ছন্নতা ও সৌজন্যতার শিক্ষা দেয়।

৪.৫ বসার স্থান পছন্দ করা প্রসঙ্গে

যে বাড়িতে মেহমান হয়ে গিয়েছেন, অর্থাৎ আয়োজক ব্যক্তি আপনাকে যে চেয়ারে বসতে বলবে, সেখানেই বসুন। বসার জায়গা নিয়ে কোনো ধরনের আলোচনা বা তর্কে জড়াবেন না। কারণ, আপনার যে স্থানটি পছন্দ হয়েছিল, সেখানে বসলে হয়তো বাড়ির ভেতরের দিকে চোখ চলে যেতে পারত কিংবা আপনার ওপর বাড়ির লোকদের দৃষ্টি পড়তে পারত। তাই এ বিষয়গুলো আমাদের বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন।

আবু মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "কোনো ব্যক্তির প্রভাবাধীন এলাকায় কেউ ইমামতি করবে না এবং তার বাড়িতে তার নির্দিষ্ট আসনে তার অনুমতি ব্যতীত বসবে না।" *আবু দাউদ : ৫৯৪*

আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া-তে ইবনে কাসির রহ. বলেছেন, "সাহাবি আদি ইবনে হাতেম তায়ি রা. ইসলাম গ্রহণের পর মদিনায় রাসূল সা.-এর সাথে দেখা করতে এলেন। রাসূল সা. আদি রা.-কে সম্মান করে একটি কুশনের ওপর আসন গ্রহণ করতে বলেন। নবিজি সা. মেঝের ওপর বসেন। এরপর রাসূল সা. তাকে নিজের ঘরে নিয়ে যান। সেখানে চামড়ার তৈরি একটি আসন ছিল। রাসূল সা. আদিকে সেই আসনে বসতে বলে নিজে মেঝেতে বসেন। আদি ইবনে হাতেম রা. রাসূল সা.-কে মেঝেতে রেখে আসনে বসতে ইতস্তত করেন। কিন্তু রাসূল সা. তাকে আসনে বসতেই বাধ্য করেন।"

খারিজা ইবনে যায়িদ একবার ইবনে শিরিন রহ.-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। বাড়িতে গিয়ে দেখেন, ইবনে শিরিন একটি কুশনের ওপর বসে আছেন। তিনি খারিজাকেও একই রকম একটি কুশনের ওপরে বসতে বললেন। খারিজা বললেন, 'অসুবিধা নেই, আমি এমনিই ঠিক আছি।' ইবনে শিরিন উত্তর দেন, "আমার বাড়িতে আমি নিজে যেভাবে থাকি বা বসি, আমার মেহমানকেও সেভাবে না বসাতে পারলে আমার ভালো লাগে না। তাই তোমাকে যেখানে বসতে বলা হয়েছে, সেখানেই বসো। তুমি নিজের মতো করে বসো না, যদি না যার বাসা তিনি তোমাকে সম্মতি দেন।"

রাসূল সা. বলেছেন, "তোমরা কেউ কারও বাড়িতে গিয়ে নামাজের ইমামতি করতে চাইবে না, যদি না যার বাড়ি তিনি সম্মত হন। আবার কেউ আয়োজকদের অনুমতি বা ইঙ্গিত ব্যতীত ইচ্ছেমতো আসন গ্রহণও করবে না।" তিনি আরও বলেন, "কোনো ব্যক্তি অপর কাউকে তার বসার স্থান থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে বসবে না।" *মুসলিম*

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বর্ণিত, “নবি সা. কোনো লোককে তার বসার স্থান থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে বসতে নিষেধ করেছেন।” *বুখারি*

যদি আপনি কোনো দাওয়াতে অন্য সবার আগে উপস্থিত হন, আর আয়োজক আপনাকে সবচেয়ে ভালো আসনটিতেই বসতে বলেন, তারপরও আপনার এমন মানসিকতা রাখা উচিত যে, দাওয়াতে বয়স্ক কোনো মুরব্বি বা কোনো আলিম অথবা সম্মানিত ব্যক্তি আসার পর ওই ভালো আসনটি তার জন্য ছেড়ে দেবেন। কারণ, আপনার তুলনায় উল্লিখিত ব্যক্তিরা ওই আসনটি পাওয়ার বেশি যোগ্য।

যদি বসার স্থান বেছে নেওয়ার সুযোগ থাকে, তা হলে চেষ্টা করুন, উত্তম লোকদের সাথে বসতে; যাদের সংস্পর্শে থাকলে ভালো কিছু শিখতে পারবেন।

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, “যে মুমিন কুরআন পড়ে তার উদাহরণ হলো কমলালেবু, যার ঘ্রাণ স্নিগ্ধ এবং স্বাদ উত্তম। আর যে মুমিন কুরআন পড়ে না তার উদাহরণ হলো খেজুর, যা সুস্বাদু কিন্তু ঘ্রাণহীন। আর যে গুনাহগার ব্যক্তি কুরআন পড়ে তার উদাহরণ লতাগুল্ম, যার ঘ্রাণ স্নিগ্ধ কিন্তু স্বাদ তিক্ত। পক্ষান্তরে, যে গুনাহগার ব্যক্তি কুরআন পড়ে না তার উদাহরণ হানযালা বৃক্ষের ফল, যার স্বাদ তিক্ত আর সুগন্ধও নেই। সৎলোকের সংসর্গ হলো কস্তুরি বিক্রেতার মতো, তুমি কস্তুরি না পেলেও তার সুবাস পাবে। আর অসৎলোকের সংসর্গ হলো কামারের সদৃশ। কালি ও ময়লা না লাগলেও ধোঁয়া হতে রক্ষা পাবে না।” *আবু দাউদ : ৪৮২৯*

সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতির পরও যদি আপনি ভালো আসনটিতে বসে থাকেন এবং আপনার তুলনায় সম্মানীয় ব্যক্তির জন্য তা ছেড়ে না দেন, তবে লোকজন আপনাকে শিষ্টাচারবোধহীন বলে মনে করবে। আপনার ভেতর ন্যূনতম সৌজন্যবোধও নেই বলে ধারণা করে নেবে। আপনি রাসূল সা.-এর প্রত্যাখ্যাত ব্যক্তিদের তালিকায় পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে। কারণ, রাসূল সা. বলেছেন, “যে বড়োদের সম্মান করে না, সে আমার দলভুক্ত নয়।”

কিছু ব্যক্তি আছে যারা কোনো দাওয়াতে বা মজলিসে গেলে নিয়মিত বিরতিতে হাই তুলতে থাকে। অনেক সময় এর ওপর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণও থাকে না। তা সত্ত্বেও চেষ্টা করতে হবে, যেন হাই তোলা সহনীয় পর্যায়ে থাকে। কারণ, এ ধরনের অনুষ্ঠানে ঘনঘন হাই তোলাটা এক ধরনের অসৌজন্যতাও বটে। আবু সাঈদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, “তোমাদের কোনো ব্যক্তির হাই এলে সে যেন তার মুখ বন্ধ করে দেয়। কারণ, শয়তান ভেতরে ঢোকে।” *আবু দাউদ : ৫০২৬*

অনেক সময় দেখা যায়, একজন অতিথি একটি চেয়ারে বসে আছেন। তার হয়তো কোনো কারণে হাত ধোয়ার প্রয়োজন পড়ল বা তিনি হয়তো ওয়াশরুমে গেলেন। তিনি চেয়ার ছেড়ে যাওয়া মাত্রই অন্য কেউ এসে সেই খালি চেয়ারটিতে বসে পড়ল। এরকম আচরণ এক ধরনের অপরিপক্কতা এবং শিষ্ঠাচার বহির্ভূত কাজ। ইসলাম এ ধরনের আচরণ অনুমোদন করে না। সুহাইল ইবনে আবু সালিহ রহ. তাঁর পিতা থেকে আবু হুরায়রা রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূল সা. বলেছেন, "যদি কোনো ব্যক্তি বৈঠক হতে কোথাও যাওয়ার পর প্রত্যাবর্তন করে, তা হলে সে পূর্বের স্থানে বসার অধিক হকদার।" *আবু দাউদ : ৪৮৫৩*

গো ধরে নিজের চেয়ারে বসে থাকার মাঝে কোনো কৃতিত্ব নেই, এতে সম্মান বাড়বে না। নিজের জন্য যথার্থ নয় এমন সম্মান পাওয়ার জন্য একগুঁয়েমি করায় মানুষের কটু কথারও শিকার হতে হবে। এই বিষয়টা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য। দায়িত্বজ্ঞানহীনতা সামাজিক মর্যাদা বাড়ানোর জন্য সহায়ক নয়। বরং এটা এমন একটি ভুল, যা আপনার সুনাম ও সম্মান ব্যাপকভাবে হানি করবে। একজন সম্মানিত মানুষকে সম্মান করতে পারলে নিজের সুনাম ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। আশেপাশের মানুষ আপনার শিষ্টাচার ও বিনয়ের প্রশংসা করবে।

যদি মাঝারি মানের মর্যাদার আসনেও বসে থাকেন, আর তখন যদি কোনো খ্যাতনামা ও সম্মানিত ব্যক্তি প্রবেশ করে, তারপরও তার সম্মানে নিজের আসন ছেড়ে দিন। বড়োদের সম্মান করা শিষ্টাচার ও সৌজন্যতারই বহিঃপ্রকাশ। ইমাম মুসলিম রহ. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, "নামাজে দাঁড়ানোর সময় তোমাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে জ্ঞানী ও মুরব্বি, তারাই আমার পেছনে দাঁড়াবে। তাদের তুলনায় যারা নবীন, তারা তাদের পেছনে দাঁড়াবে।"

মনে করুন, কোনো এক আয়োজনে হঠাৎ করে কোনো বয়স্ক ব্যক্তি আপনাকে কোনো একটি বিষয়ে আলোচনা করার কথা বলতে পারেন। অথবা প্রশ্নও করে বসতে পারেন কিংবা আপনার মতামত বা পরামর্শ চাইতে পারেন। যদি সেই ব্যক্তির কাছে এসে আপনাকে বসতে হয়, তা হলে সুন্দর হবে কথা শেষে পূর্বের আসনে ফিরে যাওয়া। যদি আয়োজকরা আপনাকে বক্তার আসনে থাকতে বলেন, তা হলে ভিন্ন কথা। না হলে নিজের আসনে ফিরে যাওয়াই উত্তম। অনেক সময় এমন হয়, কেউ কোনো একটি আসনে বসে আছেন, কর্তৃপক্ষ তাকে সেখান থেকে উঠে যেতে বললে তিনি বিব্রত বোধ করবেন। মনে রাখতে হবে, শিষ্টাচার বিবেচনাবোধ থেকেই প্রয়োগ করতে হয়। পাশাপাশি, বয়স্ক ও

জ্ঞানী লোকদের সাহচর্যে গেলে শিষ্টাচারবোধ আরও পাকাপোক্ত হয়। কারণ, সেই প্রখ্যাত বা বয়োজ্যৈষ্ঠ্য মানুষগুলো কীভাবে কাজ করছেন, তাদের আচার-ব্যবহার কেমন ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমেও নিজের কমনসেন্স, শিষ্টাচারবোধ এবং মানবিক ব্যবহার উন্নত করা সম্ভব।

আবার আপনি হয়তো এমন কোনো আয়োজনে কথা বলার সুযোগ পেয়ে যেতে পারেন, যেখানে আপনিই সবচেয়ে নবিন ও কম বয়সি। এরকম স্থানে গেলে কেউ না বলা পর্যন্ত আসন গ্রহণ করা উচিত নয়। সিট না থাকলে অন্যকে উঠিয়ে দিয়ে বসার চেষ্টা করা খুবই অসুন্দর। আপনাকে বসতে বলা হলেও সবচেয়ে ভালো সিটটি নেওয়া ঠিক হবে না। কারণ, আপনার তুলনায় কোনো যোগ্য লোক হয়তো সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারে, যিনি ভালো আসনটিতে বসার হকদার। এরকম কোনো ব্যক্তি থাকলে তার সম্মানে নিজের আসনটি ছেড়ে দেওয়ার জন্য মানসিকভাবে সব সময় প্রস্তুত থাকুন।

আয়োজন শুরু করার সময় দুআ করুন। দুআ করলে আলোচনাকে সার্বিকভাবে শয়তানের প্ররোচণার হাত থেকে রক্ষা করা যায়। আমর ইবনুল আস থেকে বর্ণিত, "যদি নিম্নোক্ত বাক্যগুলো কোনো মজলিসে পাঠ করা হয়, তা হলে বইয়ে সিলমোহর করার মতোই এই আলোচনাও তার জন্য স্থায়িত্ব লাভ করবে। বাক্যগুলো হলো سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ – হে আল্লাহ! মহিমা আপনার, আমি আপনার প্রশংসা সহকারে শুরু করছি। আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাই এবং অনুতপ্ত হয়ে আপনার নিকট ফিরে আসছি।" *আবু দাউদ : ৪৮৫৭*

৪.৬ মেহমান কখনোই পরিদর্শক নয়

যখন কোনো বাড়িতে প্রবেশ করবেন, সেখানে সাময়িক সময়ের জন্য মেহমান হোন অথবা রাতে থাকার নিয়তেই উপস্থিত হোন না কেন, খুব বেশি এদিক-ওদিক তাকাবেন না। একজন ইন্সপেক্টর বা পরিদর্শক যেভাবে সবকিছু দেখার চেষ্টা করে, তেমনটা করবেন না। বরং যতটুকু দেখা প্রয়োজন, ততটুকুর মাঝে নিজের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রাখুন। বন্ধ কিছুকে খোলার চেষ্টা করবেন না। কোনো বাক্স, মানিব্যাগ, প্যাকেট বা মোড়কে ঢাকা কোনো কিছু নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবেন না। এসব আচরণ ইসলামি শিষ্টাচারের সম্পূর্ণ বিপরীত। তা ছাড়া আয়োজকরা যে বিশ্বাস ও আস্থা থেকে আপনাকে নিমন্ত্রণ করেছেন, তার সাথেও বিষয়টা সাংঘর্ষিক। যেকোনো জায়গায় গেলে এই আদব রক্ষা করুন। যার বাড়িতে মেহমান হয়েছেন, তার সম্মান ও ভালোবাসা পাওয়ার চেষ্টা করুন।

ইমাম মুহাসিবি রহ. তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *রিসালাতুল মুসতারসিদিন*-এ বলেছেন, "দেখা মানে শুধু দেখে যাওয়াই নয়, বরং যা লুকানো বা আড়ালে রাখা আছে তার দিকে না তাকানোটাও দৃষ্টির আদবের আওতায় পড়ে।" অন্যদিকে দাউদ তায়ি রহ. বলেন, "আমাকে আমার শিক্ষক বলেছেন, ছোটো ছোটো কাজ বা গুনাহর জন্য যেমন আমাদের জবাবদিহি করতে হবে, ঠিক তেমনি ছোটো ছোটো বিষয়ে অযাচিত দৃষ্টি দেওয়ার জন্যেও আমাদের জবাবদিহি করা হবে।"

প্রাথমিক যুগে ইসলামি সমাজের পরিবেশ এমন ছিল, কেউ ভুলক্রমে নিজের বাড়ির দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেলেও উদ্বিগ্ন হতে হতো না। কারণ, সে জানত যে, অন্য কোনো ব্যক্তি তার বাড়িতে প্রবেশ করবে না; এমনকি কুদৃষ্টিও দেবে না।

৪.৭ সাক্ষাতের সময় নির্ধারণ

সাক্ষাতের জন্য পূর্বেই একটি নির্দিষ্ট সময় বাছাই করুন। অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো সময়ে সাক্ষাৎ করতে যাবেন না। বিশেষ করে খাওয়ার সময়, ঘুমানোর সময় বা বিশ্রাম নেওয়ার সময়গুলোতে কারও বাড়িতে না যাওয়াই ভালো।

> "হে মুমিনগণ! তোমাদের দাস-দাসীরা এবং (সন্তানসন্ততি) যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি, তারা যেন তিন সময়ে তোমাদের কাছে যাওয়ার আগে অনুমতি গ্রহণ করে। এগুলো হলো– ফজরের নামাজের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা জামা ঢিল করে রাখো এবং এশার নামাজের পর। এই তিন সময় অন্তরালের সময়। এ সময়ের পর তোমাদের ও তাদের জন্য কোনো দোষ নেই। তোমাদের একে অপরের কাছে তো যাতায়াত করতেই হয়, এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ বিবৃত করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" *সূরা নূর : ৫৮*

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, ইসলাম মানুষের ব্যক্তিগত বিষয় ও গোপনীয়তাকে কতটা গুরুত্ব দিয়েছে। উপরোক্ত সময়গুলোতে বিশেষ গোপনীয়তা বজায় রাখার চেষ্টা করা দরকার। কারণ, এই তিন সময়ে কেউ ঘুমাতে পারে, বিশ্রাম নিতে পারে কিংবা স্ত্রীর সাথে একান্তে সময় কাটাতে পারে। সে কারণে এই তিন সময়ে ঘরে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে বাড়ির গৃহপরিচারিকা, এমনকি ছোটো সন্তানদেরও অনুমতি নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। তাই এই সময়গুলোতে মেহমান হিসেবেও কারও বাড়িতে না যাওয়াই উত্তম। তবে জরুরি বিষয় হলে ভিন্ন কথা।

হিজরতের ঠিক পূর্ব মুহূর্তের বর্ণনা দিতে গিয়ে মা আয়িশা রা. বলেন, "রাসূল সা. কখনোই দুপুর বেলায় আমাদের বাড়িতে আসতেন না। একদিন ঠিক দুপুরের প্রথমভাগে আমরা সবাই আমাদের ঘরে বসা। তখন কেউ একজন আবু বকর রা.-কে বলল, ওই তো রাসূল সা. চাদর মুড়িয়ে এদিকে আসছেন। তিনি তো সাধারণত এ সময়ে এখানে আসেন না। রাসূল সা. এসে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তাকে অনুমতি দেওয়া হলে তিনি ভেতরে এলেন। তখন আবু বকর রা. বাড়ির সবাইকে বলছিলেন, খুব জরুরি কিছু না হলে রাসূল সা. এই সময়ে আসতেন না।" *বুখারি : ২১৩৮*

উল্লেখ্য, রাসূল সা. মদিনায় হিজরত করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুমতি পাওয়ার পরই আবু বকর রা.-কে বিষয়টা জানানোর জন্য সেদিন দুপুরে তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন।

কত সময় ধরে আপনি সাক্ষাৎকৃত ব্যক্তির সাথে অবস্থান করবেন, সেই বিষয়টা নির্ভর করবে আপনি যার বাড়িতে যাচ্ছেন তাকে কতটা ভালো জানেন তার ওপর। তার পরিস্থিতি, বাড়ির অবস্থার আলোকেই আপনি সাক্ষাতের মেয়াদ নির্ধারণ করবেন। অযথা এতটা সময় কারও বাড়িতে থাকবেন না, যাতে বাড়ির মানুষদের জন্য বিষয়টা বিব্রতকর বা কষ্টদায়ক হয়ে যায়।

ইমাম নববি রহ. তাঁর *আল আযকার* গ্রন্থে বলেছেন, "মুসলিমদের উচিত ধার্মিক মানুষদের বাড়িতে, তাদের নিকটাত্মীয়দের বাড়িতে, প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মীদের বাড়িতে মাঝে মাঝেই বেড়াতে যাওয়া। সেই সাথে এই মানুষগুলোর প্রতি উদার, দয়ালু, সহানুভূতিশীল হওয়াও আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। তবে সাক্ষাতে গেলে আমরা কত সময় সেখানে থাকব, তা সংশ্লিষ্ট বাড়ির পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। প্রতিটি সাক্ষাৎ আনন্দ ও স্বস্তিদায়ক হওয়া বাঞ্ছনীয়। সাক্ষাতের সময়টাও অনুকূল হওয়া প্রয়োজন।"

৪.৮ অভ্যর্থনা বা অভিবাদন

কোনো ঘরে বা বাড়িতে প্রবেশ করার পর সেখানে উপস্থিত সবার সাথে মুসাফাহা করুন। তাদের সালাম দিন। আতা ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, "তোমরা একে অপরের সাথে মুসাফাহা করো। এতে তোমাদের মাঝে যদি কোনো ঘৃণা ও বিদ্বেষ থাকে, তা দূর হয়ে যাবে; ভালোবাসার সৃষ্টি হবে আর শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব কমে আসবে।"

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, একবার ইয়েমেন থেকে কিছু মুসাফির নবি সা.-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে এলো। খবর পেয়েই রাসূল সা. বললেন, "ইয়েমেনের লোকেরা আসছে। তাদের মন তোমাদের তুলনায় কোমল। তারা সবকিছুর আগে সবার সাথে হাত মিলায় ও মুসাফাহা করে।" *আবু দাউদ : ৫২১৩*

বারা ইবনে আজিব রা. হতে বর্ণিত, "মুসাফাহা এমন এক আচরণ, যা পারস্পরিক সম্ভাষণ ও শিষ্টাচারকে সম্পূর্ণ করে তোলে।" *বুখারি*

কোনো মজলিসে বা আয়োজনে যদি সবার সাথে হ্যান্ডশেক বা মুসাফাহা করতে চান, তা হলে সবার আগে যিনি ওই আয়োজনের সবচেয়ে বয়স্ক মানুষ কিংবা সবচেয়ে জ্ঞানী ও ধার্মিক, তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিন। আপনার কাছাকাছি বা পাশে যিনি আছে, তার সাথে হাত মেলাতে গিয়ে সবচেয়ে প্রবীণ মানুষটিকে অবহেলা করবেন না। যদি আপনি বুঝতে না পারেন কিংবা আয়োজনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষটিকে সনাক্ত করতে না পারেন, তা হলে বাহ্যিকভাবে দেখে যাকে সবচেয়ে বয়স্ক মনে হয়, তার সাথেই আগে গিয়ে সৌজন্যতা প্রকাশ করুন।

মুসাফাহা করতে গেলে কতক্ষণ হাত ধরে থাকতে হবে, এটা নিয়ে অনেকের মাঝেই সংশয় দেখা যায়। আনাস রা. থেকে বর্ণিত, "যদি কেউ নবিজির সাথে সাক্ষাৎ করতে আসত এবং মুসাফাহা করত, তা হলে নবি সা. কখনোই তাঁর হাতটি আগে ফিরিয়ে নিতেন না।" *তিরমিযি : ২৪৯০, ইবনে মাজাহ : ৩৭১৬*

এই হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারি, শুধু মুসাফাহা করাই যথেষ্ট নয়; বরং কিছুটা সময় হাত ধরে রাখার ব্যাপারেও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তবে সেই সময়টা এত বেশি হওয়াও বাঞ্ছনীয় নয় যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য তা বিব্রতকর হয়ে যায়।

আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, "এক ব্যক্তি রাসূল সা.-কে প্রশ্ন করল, 'হে আল্লাহর রাসূল, যখন আমরা এক ভাই আরেকজন ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করব, আমরা কি একে অপরকে সম্মান জানিয়ে মাথা নত করতে পারি?' রাসূল সা. উত্তর দিলেন, 'না, কখনোই নয়।' এরপর সে আবার প্রশ্ন করল, 'তা হলে আমরা কি সাক্ষাতের সময় আমার ভাইকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে পারি?' রাসূল সা. বললেন, 'না, তোমরা এটাও করবে না।' তৃতীয়বার ওই ব্যক্তি প্রশ্ন করল, 'তা হলে আমরা কি মুসাফাহা করতে পারি?' রাসূল সা. বললেন, 'হ্যাঁ, তা করতে পারো, যদি সেও মুসাফাহা করতে আগ্রহী হয়'।" *তিরমিযি : ২৭২৮, ইবনে মাজাহ : ৩৭০২*

মসজিদে কিছু মুসল্লিকে দেখা যায়, যারা ফরজ নামাজের জামাত শেষ হওয়ার পরই ইমাম সাহেবের সাথে হাত মেলাতে ব্যস্ত হয়ে যায়। কিন্তু এ ধরনের কোনো কাজ করার দৃষ্টান্ত বা নির্দেশনা রাসূল সা.-এর সুন্নাহতে পাওয়া যায় না। খুলাফায়ে রাশেদার সময়েও এ ধরনের কোনো চর্চা ছিল না। এটা পরবর্তী সময়ের মুসলমানদের আবিষ্কার– যাকে কেউ কেউ বিদআত বলেও মনে করে। আর ধর্মীয় আচারাদির ক্ষেত্রে আল্লাহ সব ধরনের বিদআতকে নিষিদ্ধ করেছেন। ফিকাহর কিছু বইতে এই আচরণের কথা জানা যায়। তবে যারা এই আমলটিকে সমর্থন করেছেন, তারাও প্রতি ওয়াক্তে এভাবে সাক্ষাতের জন্য ব্যস্ত হওয়াকে অনুমোদন দেননি।

অনেকেই আছে, যারা অভ্যর্থনা জানানোর ক্ষেত্রে বা মেহমানকে ভক্তি জানাতে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে তিনটি কথা বলা যায়।

প্রথমত, একজন সম্মানিত মানুষ এসে বসে গেছেন, অথচ আপনি তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়েই আছেন, এটা সমর্থনযোগ্য নয়। যারা স্বৈরাচারী মানসিকতার, তারা অধীনস্থদের এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করে।

দ্বিতীয়ত, আপনি বসে আছেন, এমন সময় বাইরে থেকে কেউ এলেন এবং তিনি সম্মানিত। তা হলে দাঁড়িয়ে মুসাফাহা করে আবার বসে পড়ুন। এতটুকু করাকে ইসলামি চিন্তাবিদগণ সমর্থন করেছেন। ইমাম গাযালি এবং ইবনে হাজারের মতো ব্যক্তিরা মনে করেন, যদি কাউকে সম্মান জানানোর জন্য উঠে দাঁড়ান, তা সমর্থন করা যায়; তবে আগত ব্যক্তিকে অতি মহিমান্বিত করার জন্য উঠে দাঁড়ালে তা মেনে নেওয়া যায় না।

আর তৃতীয়ত, আপনি কাউকে দেখেই দাঁড়িয়ে যেতে পারেন। তবে অধিকাংশ আলিম এভাবে সম্মান জানানোর ব্যাপারে একমত হতে পারেননি। রাসূল সা. বলেছেন, "কোনো একজন আল্লাহর বান্দা এলো আর তাকে দেখেই যদি অন্য কোনো বান্দা দাঁড়িয়ে যায়, তা হলে সে মূলত তার জন্য জাহান্নামে একটি ঘর তৈরি করে নিল।" *আদাবুল মুফরাদ : ৯৭৭*

তবে বেশ কয়েকজন ফিকহবিদের মতে, কোনো এলাকার রীতি যদি এমন হয়, সেখানে আগত মেহমানকে দাঁড়িয়েই সম্মান জানাতে হবে, তবে সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সম্মান করা যাবে। কারণ, তাই যদি সেখানে প্রচলিত রীতিকে অগ্রাহ্য করা হয়, তা হলে হয়তো অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো পরিস্থিতিও তৈরি হতে পারে।

৪.৯ দুই ব্যক্তির সাথে বসা

আপনি কোনো ঘর বা বাড়িতে প্রবেশ করে দুজন ব্যক্তির মাঝে গিয়ে বসবেন না। তাদের বায়ে বা ডানে গিয়ে আসন গ্রহণ করুন। সুনানে আবু দাউদ ও তিরমিযিতে উল্লিখিত একটি হাদিস থেকে জানা যায়, রাসূল সা. বলেছেন, "অনুমতি ব্যতীত কখনোই দুজন মানুষের মাঝে গিয়ে বসবে না। হয়তো তারা নিজেরা পরস্পরের সাথে কথা বলছে।"

কখনও কখনও এমন হতে পারে, দুজন ব্যক্তি আপনার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে তাদের মাঝখানে বসার সুযোগ দিতে পারে। এমন হলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারেন। তবে চাপাচাপি করে বসে থাকার প্রয়োজন নেই। দুজনের মাঝখানে বসে পায়ের ওপর পা তুলে দেওয়াও সমীচীন নয়।

জনৈক মহান ব্যক্তি বলে গেছেন, "দুই ধরনের মানুষকে অশোভন হিসেবে বিবেচনা করা যায়। প্রথমত সেই ব্যক্তি, যাকে কোনো পরামর্শ দিলেন অথচ সে তা ভালোভাবে গ্রহণ না করে তা আপনার বিরুদ্ধেই ব্যবহার করল। আর দ্বিতীয়ত সেই ব্যক্তি, যাকে বসার জায়গা করে দিলেন অথচ সে আপনার সামনে পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকল।"

ধরুন, আপনি একটি অনুষ্ঠানে বসে আছেন। কেউ একজন এলেন। কিন্তু তিনি বসার ভালো জায়গা পেলেন না। তাই তিনি স্বাভাবিকভাবেই ফিরে যাবেন। এ রকম দৃশ্য অবস্থায় আপনার উচিত, একটু সরে গিয়ে সেই মেহমানকে বসতে দেওয়া। এতে হয়তো আপনার বড়ো কোনো ক্ষতি হবে না। আপনার কল্যাণে সেই ব্যক্তি আয়োজনের অংশ হওয়ার সুযোগ পাবেন। কুরআনে হাকিমে এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> "হে মুমিনগণ! যখন তোমাদের বলা হয়, মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও, তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দেবে। আল্লাহও তোমাদের জন্য প্রশস্ত করে দেবেন। যখন বলা হয় উঠে যাও, তখন উঠে যাবে। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত, আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দেবেন। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ খবর রাখেন।" *সূরা মুজাদালাহ : ১১*

আরেকটি বিষয়, যদি আপনি কোনো অনুষ্ঠানে এমনকি মসজিদেও অনেকের পরে গিয়ে উপস্থিত হন, তা হলে সামনে যাওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো বা কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি করবেন না। অনেকেই পরে এসে ডিঙিয়ে সামনে যাওয়ার

চেষ্টা করে, যা দেখতেও অশোভন। জাবির ইবনে সামুরাহ রা. থেকে বর্ণিত, "আমরা যখন নবিজি সা.-এর কাছে যেতাম, তখন যেখানে জায়গা পেতাম সেখানেই বসে পড়তাম।" *আবু দাউদ : ৪৮২৫*

যদি আপনাকে দুজন মানুষের কাছে বসতেই হয়, তা হলে কখনোই তাদের কথায় আড়ি পাতবেন না। হতে পারে তারা কোনো গোপন বা ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে। আড়িপাতা একটি বাজে অভ্যাস এবং স্বীকৃত পাপ। সহিহ বুখারির একটি হাদিস থেকে জানা যায়, রাসূল সা. বলেছেন, "যে ব্যক্তি কারও অনুমতি না নিয়েই তাদের কথাবার্তা আড়ি পেতে শোনে, কিয়ামতের দিন তার কানে তরল সিসা ঢেলে দেওয়া হবে।" *বুখারি : ৭০৪২*

সব সময় বড়োদের কাছ থেকে কিছু শেখার চেষ্টা করুন। তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে কিছু জানার থাকে। তাদের সাহচর্যে ও সংস্পর্শে সমৃদ্ধ হোন। কারণ, তারা জীবনের পরিণত অবস্থায় পৌঁছে গেছেন। সূর্য যেমন সারা দিন আলো বিকিরণ করে রাতে অন্ধকার আকাশে মিলিয়ে যায়, এই মানুষগুলোও তাদের সারাটা জীবন দেওয়া ও নেওয়ার মধ্য দিয়ে অনেক কিছু শিখেছেন, ধারণ করেছেন, যা থেকে আমরা উপকৃত হতে পারি। সব সময় বয়স্ক, পরহেজগার, আদর্শবান ও বিদ্বান মানুষদের আলোচনায় অংশ নেওয়ার চেষ্টা করুন। হয়তো খুব দ্রুত তারা দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবেন, তখন তাদের থেকে এই জ্ঞানগুলো না নেওয়ায় আপনাকে আফসোস করতে হবে।

যদি আপনারা তিনজন একসাথে বসে থাকেন, তা হলে একজনের সামনে অপর দুজনের কানে কানে কথা বলা ইসলামি আদবের খেলাফ। এটা তৃতীয় ব্যক্তির জন্য বিব্রতকর এবং সন্দেহের কারণ হতে পারে। তাই রাসূল সা. এ ধরনের পরিবেশে কানে কানে কথা বলাকে অপছন্দ করতেন।

রাসূল সা. বলেছেন, "তৃতীয় একজনের উপস্থিতিতে দুজন মানুষের ফিস ফিস করে কথা বলা বা কানে কানে কথা বলা উচিত নয়।" আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. তখন প্রশ্ন করলেন, 'যদি তারা চারজন হয়?' নবিজি সা. বললেন, 'তা হলে সমস্যা নেই'।" *বুখারি : ৬২৮৮, মুসলিম : ২১৮৩*

তিনি এমনটি বললেন কারণ, চারজন থাকলে দুজন একটু আস্তে কথা বললেও তা তেমন বিরক্তিকর পরিস্থিতির উদ্রেক করে না। কারণ, এখানে চতুর্থজনের উপস্থিতির কারণে তৃতীয় ব্যক্তি একাকীত্ব ও বিব্রত বোধ করবে না।

আরেকটি বিষয় গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিতে হবে। যদি কেউ আপনাকে বিশ্বাস করে কোনো কথা বলতে চায়, তা হলে সেই বিশ্বাসের আমানতটুকু সংরক্ষণ করাও আপনার দায়িত্ব। তার সাথে প্রতারণা করা কিংবা বিশ্বাস ভঙ্গ করা অনুচিত। তাই কোনো ব্যক্তি যদি আপনাকে গোপনে কোনো কথা বলে, তবে তা গোপন রাখা উচিত। এমনকি আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা আত্মীয়কেও অন্যের গোপন কথা বলা ঠিক নয়।

কোনো অনুষ্ঠান বা আয়োজনে গিয়ে মাত্রাতিরিক্ত উচ্চৈঃস্বরে হাসবেন না। এটা ইসলামের শিষ্টাচারের সাথে সাংঘর্ষিক। আপনি যদি মুচকি হাসেন বা মৃদু হাসেন, তা ঠিক আছে; কেননা, এই ধরনের হাসি আপনাকে স্বস্তি দেবে, অন্যদেরও বিরক্তি করবে না। কিন্তু যদি অট্টহাসি দেন এবং বার বার দেন, তা হলে উপস্থিত অনেকেই আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট হতে পারে। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, "তোমরা অতিরিক্ত হাসাহাসি করো না। অতিরিক্ত হাসি অন্তরকে মেরে ফেলে।"

৪.১০ আয়োজকদের দায়িত্ব এবং মেহমানদের অধিকার

আবু শুরাইহ আল-খুযায়ি রা. থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সা. বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। আর মেহমানের অধিকার হলো এক দিন ও এক রাত। আপ্যায়নকারীর কষ্ট হতে পারে এরূপ দীর্ঘ সময় তার নিকট মেহমানের অবস্থান বৈধ নয়। আপ্যায়ন তিন দিন। তিন দিনের অতিরিক্ত সময়ের জন্য যা সে ব্যয় করবে তা তার জন্য দান হিসেবে গণ্য হবে।" *বুখারি : ৬০১৯*

যদি হঠাৎ করে গভীর রাতে আপনার বাড়িতে কোনো মেহমান চলে আসে, তবে অতিথিপরায়ণ হোন এবং উদার আচরণ করুন। তবে, তাকে খাবার খাওয়ানোর সময় মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করবেন না। মনে রাখবেন, কোনো কিছু নিয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি না করে বরং মধ্যমপন্থা অবলম্বন করাটাই সুন্নাত। অতিথির যাতে কোনো অসুবিধা না হয়, তা নিশ্চিত করা আপনার দায়িত্ব। তার ঘুম ও ঘুম থেকে উঠার বিষয়গুলো স্বস্তিদায়ক করা উচিত। মেহমানকে জানিয়ে দিন, কোন দিক কিবলা এবং তাকে গোসল ও টয়লেট সারার স্থানগুলোও চিনিয়ে দিন।

গোসল শেষ হওয়ার পর মেহমানের তোয়ালের প্রয়োজন হবে। আবার খাবার খাওয়ার আগে বা নামাজ পড়ার আগে অজু করার প্রয়োজনও পড়বে। তোয়ালে

এবং হাত-মুখ ধোয়ার স্থানগুলো পরিচ্ছন্ন আছে কিনা তা খেয়াল করুন। বাড়ির লোকেরা যে তোয়ালে বা গামছা ব্যবহার করে, তা মেহমানকে দেবেন না। মেহমানকে আয়না এবং সুগন্ধিও দিতে পারেন। এতে হয়তো তিনি খুশি হবেন। নিশ্চিত করুন, তিনি বাথরুমে যা ব্যবহার করবেন তা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। মেহমানকে বাথরুমে নেওয়ার আগে নিজে গিয়ে দেখে আসুন। যদি সেখানে বিব্রতকর কোনো কিছু দেখতে পান, তা হলে মেহমান যাওয়ার আগেই তা সরিয়ে ফেলুন।

মেহমানের হয়তো বিশ্রাম নেওয়ার প্রয়োজনও পড়বে। তাই বাচ্চাদের চিৎকার ও অন্যান্য আওয়াজ থেকে মুক্ত স্থানে তাকে বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার চেষ্টা করুন। পরিবারের সদস্যদের একান্ত ব্যবহার্য জিনিসপত্রগুলো যেন তার চোখে না পড়ে সে দিক খেয়াল রাখুন। যদি আপনার অতিথি পুরুষ হয়, তা হলে সেই ঘর থেকে মহিলাদের ব্যবহার্য পোশাকাদি ও অন্যান্য সামগ্রী সরিয়ে ফেলুন; সম্ভব না হলে অন্তত চাদর দিয়ে ঢেকে দিন। এ ধরনের সতর্কতা ও অনুশীলন সকলের জন্যই কল্যাণকর এবং যেকোনো বিব্রতকর পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সহায়ক।

মেহমানদের সাথে কথা বলার সময় সম্মান প্রদর্শন করুন। তার সামনে ভালো পোশাক পরিধান করুন, তবে এক্ষেত্রেও বাড়াবাড়ি না করাই শ্রেয়। মেহমান আপনার খুব ঘনিষ্ঠ হতে পারে। তাই বলে এই ঘনিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে আদব বা সৌজন্যতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের শিথিলতা প্রদর্শন করতে পারেন না। ইমাম বুখারি রহ. তাঁর *আদাবুল মুফরাদ*-এ উল্লেখ করেছেন, “আমাদের সালফে সালেহিনগণ একে অপরের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় নিজেদের সর্বোত্তমভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করতেন। তাই মেহমানদের প্রতি দয়ালু ও সহানুভূতিশীল হোন। তাকে দিয়ে কখনোই ঘরের কোনো কাজ করাবেন না।” ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন, “কোনো ভালো মানুষ কখনোই তার মেহমানকে অন্যায্যভাবে খাটাতে বা কাজে লাগাতে পারে না।”

নিজের জন্য কিংবা মেহমানের জন্য শোয়ার আগে বিছানাটি ভালোভাবে ঝেড়ে নিন। পরনের লুঙ্গিটাও ভালোভাবে ঝেঁড়ে নেওয়া উত্তম। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, “যখন তোমাদের কেউ বিছানায় বিশ্রাম নেয়, সে যেন নিজের পরিধেয় বস্ত্রের (লুঙ্গির) ভেতরের দিক দিয়ে বিছানা ঝেঁড়ে নেয়। কারণ, সে জানে না তার চলে যাওয়ার পর বিছানায় কী এসেছে।” *আবু দাউদ : ৫০৫০*

অপরদিকে আপনি যদি কোনো আত্মীয় বা বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে যান, তা হলে সবার আগে তার বাড়ির অবস্থাকে বিবেচনায় নেবেন। সাক্ষাতের সময়কে যতটুকু সম্ভব সংক্ষেপ করবেন। কারণ, প্রত্যেক মানুষেরই নানা ধরনের ব্যস্ততা ও দায়িত্ব থাকে। আপনি মেহমান হলেও যার বাড়িতে গিয়েছেন, তাকে সুযোগমতো কাজে সহযোগিতা করার চেষ্টা করুন। ঘরের ভেতর অযথা দৃষ্টি দেবেন না, উঁকিঝুঁকিও মারবেন না। আপনাকে অতিথি রুমে থাকতে দেওয়া হলে সেখানেই থাকুন। অন্য কোথাও যাবেন না। যদি ঘরের ভেতর কোনো কারণে আপনাকে প্রবেশ করার সুযোগ দেওয়া হয়, তবে সেক্ষেত্রেও এদিক-সেদিক তাকাবেন না। যার বাড়িতে আছেন, তাকেও অতিরিক্ত প্রশ্ন করে বিরক্ত করবেন না।

তবে এতসব শিষ্টাচারের মধ্যে এটাও খেয়াল রাখুন, আবেগের বশবর্তী হয়ে এমন কিছু করে বসবেন না, যা আপনার জন্য বোঝা বা কষ্টসাধ্য হয়। মেহমানদারি করার ক্ষেত্রে, রান্না করার ক্ষেত্রে বাড়ির মহিলাদের ওপর এমনিতেই অনেক চাপ পড়ে। চাপ কিছুটা হওয়াই স্বাভাবিক। এ কারণেই হাদিসে মেহমান থাকার মেয়াদও সর্বোচ্চ তিন দিন নির্ধারণ করা হয়েছে।

কিন্তু এরপরও কিছু কিছু গৃহকর্তাকে দেখা যায়, যারা বাড়ির মহিলাদের এই পরিশ্রম ও কষ্টকে আমলেই নিতে চায় না। শিষ্টাচার হলো, মেহমানের সাথে ততটুকু ভালো ব্যবহার করা, যা করলে নিজের বা পরিবারের ওপর মাত্রাতিরিক্ত কষ্ট না হয়। কোনো কিছুর ক্ষেত্রেই অতিরঞ্জন, বাড়াবাড়ি বা সীমালঙ্ঘন কাম্য নয়।

মেহমানদারি ও আপ্যায়ন শেষ হওয়ার পর মেহমানের উচিত আয়োজক, বাড়ির কর্তা এবং যারা কষ্ট করে রান্না করেছেন, সকলের জন্য দুআ করা। আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, "একদিন নবি সা. সাদ ইবনে উবাদাহর বাড়িতে গেলেন। সাদ তাঁর জন্য রুটি ও যাইতুন তেল আনলেন। খাওয়ার পর নবি সা. বললেন, তোমাদের নিকট রোজাদারগণ ইফতার করেছে, সৎলোকেরা তোমাদের খাদ্য খেয়েছে এবং ফেরেশতাগণ তোমার জন্য রহমতের দুআ করেছে।" *আবু দাউদ : ৩৮৫৪*

এই হাদিসটির আলোকে কিছু কিছু ফকিহ মত দিয়েছেন, শুধু ইফতার করার ক্ষেত্রেই এমন দুআ করা যায়। তবে অধিকাংশ আলিম মনে করেন, সব ধরনের খাবার ও দাওয়াতের বেলায় এভাবে দুআ করার সুযোগ রয়েছে।

৪.১১ মেহমানদের সাথে সদ্ব্যবহার করা

কুরআনে হাকিমে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার বাণী,

> "আপনার কাছে ইবরাহিমের সম্মানিত মেহমানদের খবর এসেছে কি? যখন তারা তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, সালাম। তিনিও বললেন, সালাম! আপনারাতো অপরিচিত লোক। অতঃপর তিনি ঘরে ফিরে গেলেন এবং একটি স্বাস্থ্যবান বাছুর ভুনা করে নিয়ে এলেন। সেই বাছুরটি তাদের সামনে রেখে বললেন, আপনারা আহার করছেন না কেন?" *সূরা যারিয়াত : ২৪-২৭*

রাসূল সা. বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও শেষ বিচারের দিনের ওপর ঈমান এনেছে, সে যেন কখনও প্রতিবেশীর ক্ষতি না করে। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও শেষ বিচারের দিনের ওপর ঈমান এনেছে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও শেষ বিচারের দিনের ওপর ঈমান এনেছে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।" *বুখারি : ৬০১৮, মুসলিম : ৪৭*

যদি সঠিকভাবে মেহমানদারি করা না হয়, তবে মেহমান স্বউদ্যোগেই নিজের ন্যায্য অধিকারটুকু আদায় করে নিতে পারবে। ইসলাম তাকে সেই সুযোগ দিয়েছে। উকবাহ ইবনু আমির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "একবার আমরা বললাম, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কখনও কখনও আপনি আমাদের এমন কবিলার কাছে পাঠান, যারা মেহমানদারি করে না। এ ব্যাপারে আপনার হুকুম কী?' তিনি বললেন, 'যদি তোমরা কোনো সম্প্রদায়ের নিকট হাজির হও, আর তারা মেহমানদারি করে, তবে তোমরা তা গ্রহণ করবে। আর যদি না করে, তবে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী মেহমানদারির হক আদায় করে নেবে'।"

এমন অনেক মেহমান আছে যাদের সামনে খাবার পরিবেশন করা মাত্রই খেয়ে নেয়। আবার অনেক সময় এমনও হয়, কিছু মেহমান থাকে যারা মেজবানকে ছাড়া খেতে চায় না। যদি মেহমানরা ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাদের সাথে বাড়ির মালিককে খেতে হবে, তবে অন্য কোনো সীমাবদ্ধতা না থাকলে খাওয়া সৌজন্যতা। মেহমানদের সাথে দুর্ব্যবহার করা যাবে না, এমনকি তাদের সামনে মেজবানের বাড়ির লোকদেরও বকা দেওয়া যাবে না। কেননা, এতে মেহমান বিব্রত হতে পারেন।

মেহমান চলে যাওয়ার সময় শিষ্টাচারের দাবি হলো, তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়া। যদিও এ ব্যাপারে রাসূল সা.-এর সরাসরি কোনো হাদিস পাওয়া যায় না।

তবে আমাদের পূর্বসূরি সকল মনীষীই এই চর্চা করে গেছেন। যেমন একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। আবু উবাইদ আল কাসিম ইবনে সালাম একবার আহমাদ বিন হাম্বল রহ.-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। আবু উবাইদ জানান, "যখন আমি বিদায় নেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালাম, ইমাম আহমাদও আমার সাথে উঠে দাঁড়ালেন। আমি তাকে দাঁড়াতে না করলাম। জবাবে তিনি বললেন, 'মেহমানদারি পরিপূর্ণভাবে তখনই করা হয়, যখন একজন ব্যক্তি তার বাড়িতে আগত অতিথিকে বিদায় বেলায় দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয় এবং যে যানবাহনে করে যাবে, তাতে উঠা পর্যন্ত সঙ্গ দেয়'।"

৪.১২ স্বজনদের সান্নিধ্যে থাকা

যদি ব্যস্ততার কারণে আত্মীয়, বন্ধু বা সহযোগীদের বাড়িতে নিয়মিত যেতে না পারেন, তারপরও তাদের ফোন দিয়ে বা ম্যাসেজ পাঠিয়ে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করুন। সম্পর্ক ধরে রাখার ব্যাপারে আন্তরিক হলে আপনার ব্যাপারে তারা ভালো জানবে, ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করবে। সর্বোপরি সম্পর্কগুলো মজবুতভাবে টিকে থাকবে। আব্বাসীয় খলিফা আল মুতাসিমের উজির ছিলেন আল ফাদল ইবনে মারওয়ান। তিনি প্রায়শই বলতেন, "বন্ধুদের খোঁজখবর নেওয়াও এক ধরনের সাক্ষাৎ।"

মানুষের পাশে থাকলে এবং সহানুভূতিশীল আচরণ করলে মনও ভালো থাকে। আর পরস্পরের সাথে যোগাযোগও রক্ষা হয়। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারিম সা. বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমকে দুনিয়ার বিপদ হতে রক্ষা করবে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের বিপদ থেকে রক্ষা করবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো গরিব লোকের সঙ্গে (পাওনা আদায়ে) নম্র ব্যবহার করবে, আল্লাহ তার সঙ্গে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানেই নম্র ব্যবহার করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষত্রুটি গোপন রাখবে, আল্লাহ তার দোষত্রুটি দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানে গোপন রাখবেন। বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্য করে, আল্লাহও সেই বান্দার সাহায্য করতে থাকবেন।" *আবু দাউদ : ৪৯৪৬, শিষ্টাচার অধ্যায়*

আবু হুরায়রা রা. থেকে আরও বর্ণিত, নবি সা. বলেন, "এক ব্যক্তি তার এক ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য তার গ্রামে গেল। আল্লাহ তার যাওয়ার পথে একজন ফেরেশতা মোতায়েন করেন। ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি কোথায় যেতে চান?' সে বলল, 'আমি এই গ্রামে আমার এক ভাইয়ের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি।' ফেরেশতা বলেন, 'আপনার ওপর কি তার কোনো

অনুগ্রহ আছে, যার কারণে আপনি যাচ্ছেন?' সে বলল, 'না, আমি তাকে কেবল আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ভালোবাসি।' ফেরেশতা বলেন, 'আমি আল্লাহর দূত হিসেবে আপনার নিকট এসেছি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে এই বার্তা নিয়ে এসেছি– আপনি যেমন ওই ব্যক্তিকে ভালোবাসেন, আল্লাহও ঠিক একইভাবে আপনাকে ভালোবাসেন'।" *মুসলিম : ৫২৬৭, আহমাদ : ৯০৩৬*

৪.১৩ বন্ধু নির্বাচন

দুজন মুমিনের মধ্যে যে বন্ধুত্ব হয়, যে সহানুভূতিশীল সম্পর্ক হয়, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা খাস নিয়ামত। আল্লাহ তায়ালা তাদের মধ্যে এই ভাব-ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন বলেই বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়।

> "তিনিই তাদের অন্তরে প্রীতি স্থাপন করে দিয়েছেন। যদি তুমি দুনিয়ার সকল সম্পদও ব্যয় করতে, এ প্রীতি সঞ্চার করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ তাদের মনে হৃদ্যতা তৈরি করেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" *সূরা আনফাল : ৬৩*

তবে বন্ধু পাওয়া সহজ কোনো কাজ নয়। বন্ধু নির্বাচন যে কোনো মানুষের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক সিদ্ধান্ত। কারণ, মানুষ হিসেবে আপনার ব্যক্তিত্ব যতই প্রভাবশালী হোক অথবা হালকা হোক না কেন, বন্ধু বা কাছের মানুষগুলো আপনাকে প্রভাবিত করবেই। হয়তো আপনি তা উপলব্ধি করতে পারবেন, আবার অনেক সময় হয়তো এই প্রভাবের বিষয়টি মনের অজান্তেই অবচেতনে ঘটে যাবে। এ কারণেই রাসূল সা. সব সময় আমাদের চিন্তা ও বিচক্ষণতার সাথে বন্ধু বাছাই করতে বলেছেন।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন, "মানুষ তার বন্ধুর রীতিনীতির অনুসারী হয়। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকেই যেন খেয়াল রাখে, সে কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে।" *আবু দাউদ : ৪৮৩৩*

দুজন ঘনিষ্ট বন্ধু স্বাভাবিকভাবেই তাদের ভাবনা, চিন্তা ও অভ্যাস নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে; জীবনযাপনের প্রক্রিয়াও অনেকটা একই হয়। তাই বন্ধু নির্বাচনে সতর্কতা কাম্য। যদি আপনি একজন মানুষের ধর্মীয় অবস্থান ও অনুসৃত শিষ্টাচারের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হন, তবে তার সাথে বন্ধুত্ব করতে পারেন। একজন মানুষের জীবনে খারাপ ও ভালো বন্ধুর প্রভাব কতটা, সে সম্পর্কে রাসূল সা. বলেন,

"একজন ভালো ও খারাপ সঙ্গীর উদাহরণ হলো যথাক্রমে একজন আতর বিক্রেতা ও কামারের মতো। আতর বিক্রেতা তার সংগ্রহ থেকে আপনাকে কোনো আতর উপহার দিতে পারে। আবার আপনি কিনেও নিতে পারেন। দুটোর কোনোটা না ঘটলেও অন্তত আপনি তার কাছে গেলে সুবাসটুকু পাবেন। আর কামারের কাছে গেলে আপনার কাপড় নষ্ট হতে পারে অথবা আপনি পোড়া গন্ধ পাবেন।" *বুখারি : ৫৫৩৪*

বিশেষ করে দুই ধরনের মানুষের সাহচর্য সচেতনভাবে এড়িয়ে চলতে হবে। প্রথমত তারা, যারা ইবাদতের ক্ষেত্রে নতুন নতুন সংযোজন করে (বিদআত চর্চাকারী)। আর দ্বিতীয়ত সেই সব মানুষ, যারা অসদাচরণ করে।

ইমাম হাসান বসরি রহ. বলেন, "যাদের মধ্যে খাহেশাত আছে, নতুন কিছু সংযোজন করার মানসিকতা আছে, তাদের সঙ্গে এক স্থানে বসবে না। তাদের সাথে তর্কে জড়াবে না। এমনকি তাদের কথা শোনা থেকেও বিরত থাকবে।"

আবু কুলাবাহ রহ. বলেন, "যারা দ্বীনে নতুন কিছু প্রবেশ করাতে চায়, তাদের সাথে মিশবে না, তাদের এড়িয়ে চলবে। তাদের সাহচর্য আমি কখনোই নিরাপদ মনে করি না। তারা তোমাকে বিপথগামী করতে পারে। তুমি যেগুলো সম্বন্ধে ভালোমতো জানতে না সেগুলোতো বটেই, এমনকি জানা বিষয়গুলোর ব্যাপারেও তারা তোমাকে সংশয়ে ফেলে দিতে পারে।"

ফুদাইল ইবনে আয়াজ রহ. বলেন, "যে আলোচনায় আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, সেখানে আল্লাহ রহমতের ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তাই তোমরা কার সাথে আলোচনায় বসবে, তা নিয়ে সচেতন হও।"

যারা খারাপ কাজ করে কিংবা যাদের আচরণ ভালো নয়, বন্ধু হিসেবে তারা খুবই মারাত্মক। এমন ব্যক্তির সঙ্গে যখন বসবেন, তখন আপনার কানে স্বাভাবিকভাবেই বাজে ও অশ্লীল শব্দ প্রবেশ করবে। তার মিথ্যা কথা, গিবত ও পরনিন্দাসুলভ কথাবার্তাও শুনতে হবে। যদি সে ফরজ ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে শিথিল হয়, তা হলে সেই শিথিলতা আপনাকেও গ্রাস করতে পারে। এরকম অসৎসঙ্গীর অন্য সব পাপের প্রভাবও আপনার ওপর পড়তে পারে। আর এ কথা আমরা জানি, পাপ ক্রমশ মানুষের অন্তরকে মেরে ফেলে। অসৎ সঙ্গের কারণে ইতোমধ্যে বহু মানুষ বিপথগামী হয়েছে, এরকম অসংখ্য নজির আমাদের চারপাশেই আছে। তাই বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা, জ্ঞান ও বিচক্ষণতা প্রয়োজন।

৪.১৪ বোনদের প্রতি একটি পরামর্শ

আমার মুসলিম মা-বোনদের উদ্দেশ্য করে একটি কথা বলতে চাই। যদি কোনো আত্মীয় বা মুসলিম বোনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান, তা হলে খুব সচেতনভাবে সাক্ষাতের দিন, তারিখ ও সময় নির্ধারণ করুন। আত্মীয় বা বন্ধু হলেও তারও সুবিধাজনক বা বিব্রতকর সময় বলতে কিছু থাকতে পারে।

কাঙ্ক্ষিত সাক্ষাৎটি সর্বদা সুন্দর, সংক্ষিপ্ত এবং স্বস্তিদায়ক করার চেষ্টা করুন। সাক্ষাৎ যেন কোনোভাবেই একঘেয়ে বা বিরক্তিকর না হয়। সাক্ষাতের সময় অহেতুক টেনে লম্বা করবেন না। সাক্ষাতের উদ্দেশ্য যেন হয় সম্পর্কের উন্নয়ন। অর্থাৎ পুরোনো কোনো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরও বেশি সুন্দর করাই যেন হয় সাক্ষাতের উদ্দেশ্য।

সাক্ষাতের সময় যদি সংক্ষেপ হয়, তবে তা সুখকর হয়। কিন্তু অহেতুক কথা বলে যদি সময় দীর্ঘায়িত করা হয়, তবে তা বিরক্তির উদ্রেক করতে পারে। কারণ, বেশিক্ষণ সময় দিলে সেই সুযোগে নানা ধরনের অপ্রয়োজনীয় ও বাজে কথাবার্তাও হতে পারে। এতে সাক্ষাতের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত গোটা সাক্ষাৎটি অপ্রয়োজনীয় কাজে পরিণত হতে পারে। প্রখ্যাত তাবেয়ি মুহাম্মাদ ইবনে শিহাব যুহরি রহ. বলেন, "যখন কোনো সাক্ষাতের সময় দীর্ঘ হয়, তখন শয়তান তাতে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পায়।"

চেষ্টা করুন, যাতে কোথাও বেড়াতে গেলে আপনার কথাগুলো খুবই পরিমিত কিন্তু মূল্যবান হয়। আপনার কথাগুলো যেন অপরকে উপকৃত করে। সেই সাথে সব ধরনের গিবত, বাজে আড্ডা এবং অলস ও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করুন। একজন সত্যিকারের মুসলিম নারী কখনোই এ জাতীয় কাজ করে সময় নষ্ট করতে পারে না।

মুত্তালিব ইবনে আবদুল্লাহ মাখযুমি থেকে বর্ণিত, "রাসূল সা.-এর নিকট এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, 'গিবত কী (গিবত কাকে বলে)?' রাসূল সা. বললেন, 'কারও অবর্তমানে তার এমন কথা প্রকাশ করা, যা সে শুনলে অসন্তুষ্ট হবে।' অতঃপর লোকটি আবার বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! কথা যদি সত্য হয় (অর্থাৎ যা বলা হচ্ছে তা যদি মিথ্যা না হয়, বরং সত্য হয় তা হলেও কি তা গিবত হবে)?' রাসূল সা. বললেন, 'যদি মিথ্যা হয়, (তবে তাকে গিবত বলা হয় না; বরং) তা বুহতান (অপবাদ)'।" *মুসলিম : ২৫৮৯*

কথোপকথনের আদব

একজন মুসলিমের উচিত সর্বদা মিথ্যা কথা, অপবাদ দেওয়া, কুৎসা রটানো, গিবত করার মতো অসদাচরণ থেকে বিরত থাকা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা. যে কথা বলতে নিষেধ করেছেন, সে কথাগুলো থেকে মুসলিমদের সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে। মানুষের কথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কথার প্রভাব কতটা গভীর হয়, সে সম্বন্ধে অনেকেরই সুস্পষ্ট ধারণা নেই। একজন মানুষের সামান্য একটা কথার কারণে যেমন তার দুনিয়াবি অনেক অর্জন ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, ঠিক তেমনি পরকালের জীবনও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

৫.১ আলাপের জন্য সঠিক বিষয় বাছাই করতে হবে

সূরা হজে ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তারা পথপ্রদর্শিত হয়েছিল পবিত্র কথার দিকে এবং পরিচালিত হয়েছিল প্রশংসিত আল্লাহর পথে।" *সূরা হজ : ২৪*

কারও সাথে যখন কথা বলবেন, তখন খেয়াল রাখবেন, উক্ত পরিস্থিতিতে কোন ধরনের কথা বলা উচিত। কথা সংক্ষেপ করার চেষ্টা করুন। যারা সেখানে উপস্থিত আছে, তাদের মাঝে যদি আপনি সবচেয়ে কম বয়সি হন, তা হলে অনুমতি দেওয়ার আগে কথা শুরু করবেন না। যদি নিশ্চিত হতে পারেন, আপনার কথা সবাই ভালোভাবে নেবে এবং অন্যান্য উপস্থিতিও বিষয়টাকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করবে, তবেই কেবল কথা বলবেন। আলোচনা অযথা টেনে লম্বা করবেন না। কথা বলার সময় গলার স্বর সংযত রাখুন।

খাদিমে রাসূল আনাস বিন মালিক রা. বলেছেন, "রাসূল সা.-এর কথা ছিল খুবই সুস্পষ্ট এবং পরিমিত। তিনি খুব বেশি কথা বলতেন না, আবার খুব কমও নয়। তিনি বাচালের মতো বেশি কথা বলা কিংবা গাল ভরে কথা বলে যাওয়াকে পছন্দ করতেন না।" আমাদের মা আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত বুখারি ও তিরমিযি

শরিফের একটি হাদিস থেকে জানা যায়, রাসূল সা.-এর কথা এতটাই সংক্ষেপ ও স্পষ্ট ছিল যে, তার শব্দগুলো গোনা যেত। তিনি অবিরাম এবং তাড়াতাড়ি কথা বলতেন না। বরং ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে কথা বলতেন। ফলে একটি বিষয় অপর বিষয় থেকে পৃথক হয়ে যেত এবং শ্রোতারা খুব ভালোভাবে তাঁর কথা উপলব্ধি করতে পারত। *তিরমিযি : ৩৬৩৯*

জাবির রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, "তোমাদের যে ব্যক্তির চরিত্র ও আচরণ সর্বোত্তম, তোমাদের মধ্যে সে-ই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় এবং কিয়ামত দিবসেও আমার খুবই নিকটে থাকবে। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার নিকট সবচেয়ে বেশি ঘৃণ্য, সে ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে আমার নিকট হতে অনেক দূরে থাকবে। আর তারা হলো, বাচাল, ধৃষ্ট-নির্লজ্জ এবং অহংকারে মত্ত ব্যক্তিরা।" *তিরমিযি : ২০১৮*

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, "(অনেক সময়) মানুষ কথা বলে, কিন্তু সে কথা তাকে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে, সে তা জানে না। অথচ সেই কথার জন্য আল্লাহ তায়ালা তার জন্য সন্তুষ্টি কিয়ামত পর্যন্ত লিখে দেন। আবার কোনো সময় আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক এমন কথা কেউ বলে, সেই কথা তাকে কোথায় নিয়ে যাবে সে তা জানে না, অথচ সেই কথার জন্য আল্লাহ তায়ালা তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত স্বীয় অসন্তুষ্টি লিখে দেন।" *বুখারি : ৬৪৭৭, মুসলিম : ২৯৮৮*

যদি আলোচনার সময় আজান শোনা যায়, তবে আজান শুনুন এবং আজানের জবাব দিন। অনেক মানুষ, এমনকি ইসলামি জ্ঞানসম্পন্ন অনেক মানুষকে আজানের সময় দিব্যি কথা বলে যেতে দেখা যায়। এটা একদমই উচিত নয়। শুধু আলোচনা করা নয়; কেউ যদি কুরআন তিলাওয়াত বা অন্য কোনো বই পড়ার সময়ও আজান শুনে, তারপরও অধ্যয়ন বন্ধ রেখে আজান শোনা এবং জবাব দেওয়া উচিত। আমরা বাড়িতে থাকি অথবা অফিসে কিংবা দোকানে, যেখানেই থাকি না কেন আজানের শব্দ কানে আসামাত্রই হাতের কাজ থামিয়ে দিয়ে আজান শোনা প্রয়োজন।

ইমাম কাসানি রহ. তাঁর *বাদাইয়ুস সানায়ি* গ্রন্থে বলেন, "যার কানে আজান বা ইকামতের শব্দ প্রবেশ করবে, তার সঙ্গে সঙ্গে কথা বলা থামিয়ে দেওয়া উচিত।

যদি সেই সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কুরআন পড়ে বা এরকম কোনো ভালো কাজও করে, তারপরও সব কাজ বাদ দিয়ে আজান শোনা এবং জবাব দেওয়া উচিত।"

আজান হলো অন্তরের খোরাক। আজান অন্তরে ঈমানি চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং অন্তরকে উন্নত করে। তাই, আজানের যে উপকারিতা তা অন্য কিছুর জন্য নষ্ট করা উচিত নয়। আজানের সময় অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত থাকলে আজানের উপকারিতা আস্বাদন করা যায় না। আপনার সন্তান ও পরবর্তী প্রজন্মকেও এই বিষয়টি শেখানো দরকার।

সহিহ বুখারিতে আবু সাইদ খুদরি রা.-এর বর্ণনায় এসেছে, রাসূল সা. বলেছেন, "যদি তোমরা আজান শুনতে পাও, তা হলে মুয়াজ্জিন যা বলছে তোমরাও তাই পাঠ করো।" *বুখারি : ৬১১, আজান অধ্যায়*

ইমাম আবদুর রাজ্জাক রহ. তার *মুসান্নাফ* গ্রন্থে ইবনে জুরাইযের এই উদ্ধৃতিটি উল্লেখ করেছেন, "আমি জেনেছি যে, সোনালি যুগের মানুষেরা যেভাবে মনোযোগ দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত শুনতেন, ঠিক একই রকম মনোযোগ দিয়ে আজানও শুনতেন। যদি মুয়াজ্জিন বলতেন, 'নামাজের দিকে আসো', তা হলে তারা বলতেন, 'আল্লাহর রহমত ও সাহায্যের বরকতে আমরা আসব।' যদি মুয়াজ্জিন বলতেন, 'তোমরা কল্যাণের পথে আসো', তখনও তারা বলতেন, 'আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা কল্যাণের পথে আসব'।"

•

৫.২ মার্জিত স্বরে কথা বলুন

যদি কোনো অনুষ্ঠানে বা একান্তে কোনো মেহমানের সঙ্গে কথা বলেন, তবে চেষ্টা করবেন যেন কথা বলার সময় আপনার স্বর শালীন পর্যায়ে থাকে। আওয়াজ তুলনামূলক নিচু ও শ্রুতিমধুর থাকে। গলার স্বর বেশি উচ্চকিত হওয়াটা আদব ও শিষ্টাচারের বরখেলাফ। তা ছাড়া চড়া গলায় কথা বললে মনে হয় যেন শ্রোতাদের প্রতি আপনার শ্রদ্ধাবোধেরও ঘাটতি রয়েছে। এই আদবটি বন্ধুবান্ধব, সঙ্গী-সঙ্গিনি, সহযোগী, সহকর্মী, আগন্তুক, মুসাফির, আত্মীয়স্বজন, যুবক বা বৃদ্ধ– সকলের ক্ষেত্রেই বজায় রাখা উচিত। পিতামাতা কিংবা এ পর্যায়ের অভিভাবকের সাথে কথা বলার সময় বিষয়টা আরও সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ রাখা দরকার।

যারা শ্রদ্ধার পাত্র, তাদের সঙ্গে কথা বলার সময় সচেতন থাকুন। যদি সম্ভব হয়, তবে কথা বলার সময় মুখে ধরে রাখুন মৃদু হাসি। কারণ, বক্তা নিজের

চেহারা খুব রুক্ষ করে থাকলে শ্রোতারা কথাগুলোকে সহজভাবে নিতে পারে না। আলিমদের মধ্যে অনেককেই সাধারণ মানুষ কঠোর ও কট্টরপন্থি মনে করে। তাই আলিম ও ইমামদের উচিত কথা বলার সময় মুখে নমনীয়ভাব প্রদর্শন করা।

কুরআনের হাকিমের সূরা লুকমান থেকে আমরা এমনই শিক্ষা পাই। লুকমান আ. নিজ সন্তানকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "চলাফেরায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করো এবং কণ্ঠস্বর নিচু রাখো। নিঃসন্দেহে গাধার স্বরই সবচেয়ে শ্রুতিকটু।" *সূরা লুকমান : ১৯*

সূরা হুজুরাতে আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

> "হে মুমিনগণ! তোমরা নবির কণ্ঠস্বরের ওপর তোমাদের আওয়াজ উঁচু করো না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেভাবে উঁচুস্বরে কথা বলো, তাঁর সাথে সেভাবে উঁচুস্বরে কথা বলো না। এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে, যা তোমরা টেরও পাবে না। যারা আল্লাহর রাসূলের সামনে নিজেদের আওয়াজ নিচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে শিষ্টাচারের জন্য শোধিত করেছেন। তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।" *সূরা হুজুরাত : ২-৩*

সহিহ বুখারিতে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. থেকে বর্ণিত, "সূরা হুজুরাতের এই আয়াতগুলো নাজিল হওয়ার পর উমর ফারুক রা. এমনভাবে নবিজি সা.-এর সাথে কথা বলতেন, যেন মনে হচ্ছে উমর ফিসফিস করে শব্দ করছেন। উমর ফারুক রা. এতটাই নিচুস্বরে কথা বলতেন যে, রাসূল সা. অনেক সময় উমরের কথা বুঝতে পারতেন না। তাই তিনি দ্বিতীয়বার উমর ফারুককে প্রশ্ন করে কথা বুঝে নিতেন।"

আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, "নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ নম্র এবং তিনি নম্রতা পছন্দ করেন। তিনি নমনীয় লোককে যা দান করেন তা কঠিন স্বভাবের লোককে দান করেন না।" *আবু দাউদ : ৪৮০৭*

আপনার কথাবার্তা অবশ্যই পরিষ্কার, স্পষ্ট, সংক্ষেপ এবং বস্তুনিষ্ঠ হতে হবে; বাচালের মতো শুধু কথা বলে গেলেই হবে না। বুখারি ও মুসলিম শরিফের একটি হাদিসে খাদিমে রাসূল আনাস রা.-এর বর্ণনায় জানা যায়, রাসূল সা.-এর কথাবার্তা ছিল পরিমিত, স্পষ্ট ও গোছানো। তিনি অযাচিতভাবে কথা বাড়াতেন না। উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রা. বলেন, "রাসূলুল্লাহ সা.-এর বক্তব্য ছিল সুস্পষ্ট, প্রত্যেক শ্রোতাই তাঁর বক্তব্য বুঝতে পারত।" *আবু দাউদ : ৪৮৩৯*

কথা বলার সময় খুব আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে কথা বলা শোভনীয় নয়। ঝগড়ার ভঙ্গিমাতেও কথোপকথন চালিয়ে যাওয়া ঠিক নয়। কথা এমনভাবে বলা উচিত নয়, যাতে শ্রোতার কাছে তা নেতিবাচক মনে হয়।

রাসূল সা. বলেছেন, "মুমিন দোষারোপকারী ও নিন্দুক হয় না, অভিসম্পাতকারী হয় না, অশ্লীল কাজ করে না এবং কটুভাষীও হয় না।" *তিরমিযি : ১৯৭৭*

কারও সম্বন্ধে কথা বলতে গিয়ে কিংবা কারও সঙ্গে কথোপকথনের সময় তাকে তুচ্ছ করা উচিত নয়। আমাদের অনেকের মাঝেই এমন বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে। আমরা কথা বলতে বলতে এক ধরনের দাম্ভিকতায় ডুবে যাই। তখন সামনে থাকা মানুষটিকে আর পাত্তা দিতে চাই না। বিশেষ করে, যদি সে বয়সে ছোটো বা পদে ছোটো হয়, তবে তাকে নানাভাবে হেয় করা হয়। ইসলাম এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা পছন্দ করে না।

রাসূল সা. বলেছেন, "একজন মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমের সম্পদ, সম্মান ও জীবনে হস্তক্ষেপ করা হারাম। কোনো ব্যক্তি নিকৃষ্ট প্রমাণিত হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছজ্ঞান করে।" *আবু দাউদ : ৪৮৮২*

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "আল্লাহ তায়ালা তোমাদের তিনটি কাজে সন্তুষ্ট হন এবং তিনটি কাজে অসন্তুষ্ট হন।
যেসব কাজে তিনি সন্তুষ্ট হন সেগুলো হলো–
১) তোমরা তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না।
২) আল্লাহর রজ্জু (অর্থাৎ কুরআন) মজবুত করে ধরবে।
৩) আল্লাহ যাকে শাসনের ভার দিয়েছেন তাকে নসিহত করবে।
যেসব কাজে তিনি অসন্তুষ্ট হন সেগুলো হলো–
১) অধিক কথা বলা,
২) অপব্যয় করা,
৩) অধিক চাহিদা।"
মুসলিম : ১৭১৫

হাফিজ যাহাবি রহ. প্রখ্যাত তাবেয়ি ইমাম ইবনে শিরিন রহ.-এর জীবনীতে লিখেছেন, "যখন তিনি মায়ের কাছে যেতেন, তিনি এতটাই মৃদুস্বরে কথা বলতেন যে, মনে হতো, তিনি যেন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।"

অন্যদিকে আবদুল্লাহ বিন আওন আল বাসরি তাঁর শিক্ষক ইমাম ইবনে শিরিন সম্পর্কে বলেছেন, "একবার তাঁর মা তাকে ডেকে পাঠালেন। মা তাকে যে স্বরে ডেকেছেন, তিনি তাঁর থেকে একটু উঁচু স্বরে উত্তর দিয়েছিলেন। এতে তিনি অনেক বেশি লজ্জা ও ভয় পেয়েছিলেন, অনুশোচনায় রীতিমতো কাবু হয়ে পড়েছিলেন। শুধু তা-ই নয়, এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে তিনি দুজন ক্রীতদাস মুক্ত করে দিয়েছিলেন।"

প্রখ্যাত কারি আসিম রহ. বলেন, "আমি একবার উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.-এর সাথে সাক্ষাতে গিয়েছিলাম। তখন দেখলাম, একজন ব্যক্তি উমরের সাথে একটু উঁচুগলায় কথা বলছে। সাথে সাথেই উমর ইবনে আবদুল আজিজ তাকে থামিয়ে দিলেন এবং বললেন, তোমার এত জোরে কথা বলার দরকার নেই। এতটুকু জোরে কথা বলো যেন শ্রোতারা তোমার কথা শুনতে পায়, তাতেই চলবে।"

যে বিষয়ে জ্ঞান নেই, পরিষ্কার ধারণা নেই, সেই বিষয়ে কথা না বলাই শ্রেয়। কুরআন মাজিদে আল্লাহ পাক বলেন,

> "যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, সেই বিষয়ে কথা বলো না, আবার সাক্ষ্য দিতেও যেয়ো না। নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তর প্রত্যেকটির ব্যাপারেই তোমাদের প্রশ্ন করা হবে।" *সূরা ইসরা : ৩৬*

কথা বলার সময় সত্য ও যথাযথ কথা বলারই চেষ্টা করতে হবে। অনেকে নিজের অবস্থা সম্পর্কে উচ্চ ধারণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে অতিরঞ্জিত কথা বলে। অনেক সময় কথা বাড়িয়েও বলে। এগুলো পরোক্ষ মিথ্যার সমতুল্য। প্রত্যক্ষ বা সরাসরি মিথ্যা তো বলা যাবেই না, এমনকি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মিথ্যা বলারও অনুমতি ইসলামে নেই।

আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, "তোমরা মিথ্যা বর্জন করো। কেননা, মিথ্যা পাপের দিকে ধাবিত করে এবং পাপ জাহান্নামে নিয়ে যায়। কোনো ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা বললে এবং মিথ্যাচারকে স্বভাবে পরিণত করলে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কাছে তার নাম মিথ্যুক হিসেবেই লেখা হয়। তোমরা অবশ্যই সততা অবলম্বন করবে। কারণ, সত্য নেক কাজের দিকে পথ দেখায় এবং নেক কাজ জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। আর কোনো ব্যক্তি সর্বদা সততা বজায় রাখলে এবং সততাকে নিজের স্বভাবে পরিণত করলে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কাছে তার নাম পরম সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়।" *আবু দাউদ : ৪৯৮৯*

আবু উমামাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিজের অবস্থান ন্যায়সংগত হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া পরিহার করবে, আমি তার জন্য জান্নাতের মধ্যে একটি ঘরের জিম্মাদার। যে ব্যক্তি তামাশার ছলেও মিথ্যা বলে না, আমি তার জন্য জান্নাতের মাঝে একটি ঘরের জিম্মাদার। আর যে ব্যক্তি তার চরিত্রকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে, আমি তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত একটি ঘরের জিম্মাদার।" *আবু দাউদ : ৪৮৮০*

এক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমরা অনেককে নিয়েই হাসাহাসি করি। কোনো আয়োজনে বা ঘরোয়া অনুষ্ঠানে যদি কেউ হাস্যকর কিছু করে, আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করে, তবে তাতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা প্রায়শ শালীনতার সীমানা অতিক্রম করে যাই। আমরা অন্য কোনো মানুষকে তুচ্ছ করে, তাকে অনেকের সামনে অপমান করে মজা পেতে পছন্দ করি। অনেকে আবার অহেতুক মিথ্যা কথা বলেও হাসানোর চেষ্টা করে। রাসূল সা. বলেছেন, "মানুষকে হাসানোর জন্য যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে তার জন্য ধ্বংস, তার জন্য ধ্বংস, তার জন্য ধ্বংস।" *আবু দাউদ : ৪৯৯০*

৫.৩ কথা শোনার আদব

যদি কোনো বক্তা বা আলোচক এমন কিছু বলে যা আপনি জানেন, তারপরও এটা তাৎক্ষণিক প্রকাশ করার চেয়ে এভাবে থাকুন যে, আজই প্রথম শুনলেন। আপনি যে বিষয়টি জানেন, তা জানান দিতে খুব বেশি তৎপর হওয়ার দরকার নেই। আপনি জানেন বলে তার আলোচনায় হস্তক্ষেপ করা বা থামিয়ে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই; বরং পূর্ণ মনোযোগিভাব প্রদর্শন করুন।

প্রখ্যাত তাবেয়ি আতা ইবনে আবি রাবাহ রহ. বলেন, "একবার আমার কাছে একটি যুবক এলো। সে আমাকে এমন কিছু কথা বলল, যা হয়তো তার জন্মের আগে থেকেই জানি। তারপরও মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনলাম এবং এমন ভঙ্গিতে শুনলাম, যেন কথাগুলো তার মুখ থেকেই প্রথম শুনছি।"

দুই উমাইয়া খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ এবং হিশাম ইবনে আবদুল মালিকের সান্নিধ্য পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল খালিদ বিন সাফওয়ান আত তামিমির। তিনি কথা শোনার নম্রতা প্রসঙ্গে বলেন, "যদি কোনো মানুষ আপনার সামনে এমন কিছু বলে, যা আগে থেকেই জানেন, তবে তাকে থামিয়ে দেবেন না। তার সামনে পূর্ব থেকেই জানার বিষয়টি খোলাসা করবেন না। কারণ, এটা খুবই রুক্ষ ও অশোভন আচরণ।"

ইমাম মালিক রহ.-এর ঘনিষ্ঠ সহযোগী আবদুল্লাহ বিন ওয়াহাব আল কুরাইশি আল মাসরি রহ. বলেন, "এমন অনেকবার হয়েছে, কোনো একজন ব্যক্তি আমার কাছে একটি ঘটনা বলছে, যা আমি সেই ব্যক্তির পিতামাতার বিয়ের সময় থেকেই জানি। তারপরও আমি উক্ত বক্তার সামনে এমন মনোযোগ দিয়েছি, যেন তার বলা ঘটনাটি আজই প্রথম শুনছি।"

ইবরাহিম বিন জুনাইদ রহ. তাঁর সন্তানকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "যেভাবে তুমি কথা বলার বিদ্যা রপ্ত করেছ, ঠিক একইভাবে কথা শোনার কৌশলও রপ্ত করবে। ভালো করে কথা শোনার মানে হলো, বক্তার চোখের দিকে চোখ রাখা। বক্তাকে বক্তব্য পুরোপুরি শেষ করার সুযোগ দেওয়া এবং তার কথায় কোনো রকমের হস্তক্ষেপ না করা।"

রাসূল সা.-এর এরকম হাদিস আছে, তিনি এক ভরা মজলিসে কথা বলছিলেন। এমন সময় একজন আগন্তক এসে তাকে একটি প্রশ্ন করল। তিনি তা শুনলেন, কিন্তু কোনো উত্তর দিলেন না। সবাই মনে করল, রাসূল সা. হয়তো শুনতে পাননি। এরপর আবার তাকে প্রশ্ন করা হলো, সেবারও তিনি জবাব দিলেন না। নিজের আলোচনা শেষ করে তারপর তিনি প্রশ্নকারীকে প্রশ্ন করার সুযোগ দেন এবং তার উত্তর প্রদান করেন।

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, যখন কোনো আলোচক বক্তব্য প্রদান করেন, তখন তাকে থামিয়ে দিয়ে অন্য কথা তোলা অশোভন। আমরা নিজেরা কথা বলার সময় যদি কেউ থামিয়ে দেয় কিংবা ভালোভাবে না শোনে তবে আমরা বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হই। এটা অন্যের বেলায়ও একইরকম হয়। তাই আমরা যা নিজের জন্য পছন্দ করি না, তা অন্যের বেলায়ও হতে দেওয়া অনুচিত। কোনো বক্তা আলোচনা করলে তা আমাদের মনোযোগের সঙ্গে শোনা প্রয়োজন।

৫.৪ অপেক্ষাকৃত কম গ্রহণযোগ্য মানুষের সাথেও সুন্দরভাবে কথা বলা

অনেক সময় আমরা যাকে একটু কম পছন্দ করি, তার সাথে সুন্দরভাবে কথা বলতে চাই না। এমনও হয়, আমরা এমন চেহারা করে রাখি অথবা আমাদের শারীরিক ভাষা এমন থাকে, যা দেখেই বোঝা যায় যে আমরা সাক্ষাৎপ্রার্থীকে পছন্দ করতে পারছি না। ইসলামে এ ধরনের আচরণ গ্রহণযোগ্য নয়।

উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, "কেউ একজন রাসূল সা.-এর কাছে সাক্ষাৎ করতে অনুমতি চাইল। আমি তখন নবিজির সাথে ঘরে ছিলাম। তিনি বললেন, 'এই লোকটি ভালো নয়।' এরপর তাকে আসার অনুমতি প্রদান করলেন।

বেশিক্ষণ না যেতেই আমি ওই লোকটির সাথে রাসূল সা.-কে হাসিমুখে কথা বলতে শুনতে পেলাম।' লোকটি চলে যাওয়ার পর বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! এইমাত্র আপনি তাকে মন্দ বললেন, আর এখনই তার সাথে হাসছিলেন!' তখন রাসূল সা. বললেন, 'সকলের চাইতে মন্দ ওই ব্যক্তি, যার অনিষ্টতার জন্য মানুষ তাকে ভয় করে।' অর্থাৎ মানুষ এই ভয়ে থাকে যে, লোকটা যেকোনো সময় আমাদের কষ্ট দিতে পারে।" *বুখারি : ৬০৩২, মুসলিম : ২৫৯১*

৫.৫ আলোচনা ও বিতর্ক

যদি কোনো আলোচনা ভালোমতো বুঝতে না পারেন, তবে আলোচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিজেকে সংযত করুন। বক্তব্য শেষ হলে মার্জিতভাবে, নম্রতার সাথে, সুন্দর ভূমিকা দিয়ে আরেকটু পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা দাবি করুন। কখনোই কারও বক্তব্য চলাকালীন হস্তক্ষেপ করবেন না। এটা আদবের বরখেলাফ। অবশ্য একাডেমিক কোনো আলোচনা বা স্টাডি সার্কেলের জন্য এই আদব ক্ষেত্রবিশেষে প্রযোজ্য না-ও হতে পারে। একাডেমিক আলোচনার ক্ষেত্রেও প্রশ্ন করার সময় নম্রতা ও শ্রদ্ধাপ্রদর্শন কাম্য। খলিফা আল মামুন বলতেন, "শুধু শোনার চেয়ে পারস্পরিক আলোচনায় জ্ঞান বেশি সুরক্ষিত হয়।"

প্রখ্যাত বিদ্বান ও ইতিহাসবিদ আল হাইসাম বিন আদি চারজন আব্বাসীয় খলিফা তথা আবু জাফর আল মানসুর, আল মাহদি, আল হাদি এবং আল রশিদের ঘনিষ্টজন ছিলেন। তিনি প্রায়শই বলতেন, "কথা বলা বা বক্তব্য দেওয়ার সময় কাউকে বিব্রত করা কিংবা কথার মাঝখানে মন্তব্য করা অথবা কথা শেষ হওয়ার আগেই থামিয়ে দেওয়াকে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ আদবের বরখেলাফ মনে করেন।"

যদি আপনি প্রশ্ন তোলার আগেই অন্য কেউ আলোচককে প্রশ্ন করে বসে, তবে তিনি কী উত্তর দিচ্ছেন তা মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করুন। হয়তো তার ব্যাখ্যা থেকে আপনি উপকৃত হতে পারেন। আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যেতে পারেন। ফলে বিষয়টি আরও ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারবেন। এমন কোনো শব্দ প্রয়োগ করবেন না, যা বক্তাকে হেয় করে। এমনকি আপনার চেহারাতেও যেন তার প্রতি অপমানসূচক কোনো ছাপ না থাকে।

রাসূল সা. বিতর্কে কম জড়াতে বলেছেন। তিনি বলেন, "তোমরা কুরআন পড়ো, তা নিয়ে আলোচনা করো, এমনকি মতপার্থক্যও করতে পারো যতক্ষণ তোমাদের অন্তর পরস্পরের সাথে মিলে থাকে। কিন্তু যদি দেখো যে, অন্তরের

ভালোবাসাটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ছে, তা হলে বিলম্ব না করে তিলাওয়াত বন্ধ করে স্থান ত্যাগ করাই উত্তম।” *আহমাদ : ৭৭৮৯, আবু দাউদ : ৪৬০৩*

যখন কোনো জ্ঞানী বা বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি কথা বলবে, তখন মনোযোগ দিয়ে তার কথা শোনার চেষ্টা করুন। তাদের কথা বলার সময় অন্য কারও সাথে আলোচনা বা একান্ত আলাপে সম্পৃক্ত হবেন না। নিজের মনকে অন্য কাজে ব্যস্ত রাখবেন না। তার আলোচনার দিকে মনোনিবেশ করুন। যদি আলোচনায় কিছু না বোঝেন, তবে আলোচনা শেষ হওয়া অবধি অপেক্ষা করুন। কথা শেষ হলে তারপর নম্রতার সঙ্গে প্রশ্ন করুন। প্রশ্ন করতে গিয়ে গলার স্বর যেন উঁচু না হয়। আশেপাশের সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য অহেতুক হম্বিতম্বি করবেন না। কখনও আলোচকের কথার মাঝখানে বাধা দেবেন না।

আপনি উত্তরটি ঠিকঠাক জানেন– এমন আত্মবিশ্বাস না থাকলে উত্তর দিতে খুব বেশি ব্যস্ত না হওয়াই উত্তম। যে বিষয়টি কম জানেন, তা নিয়ে অহেতুক তর্কে জড়াবেন না। তর্কের জন্য তর্ক না করাই শ্রেয়। যারা আপনার মতের সাথে ভিন্নমত পোষণ করবে, তাদের সামনে অহংকারীর মতো আচরণ করবেন না। তাদের গুরুত্ব দিতে হবে। তর্কের সময় কোনো অবস্থাতেই ভিন্নমতাবলম্বীদের হেয় করার চেষ্টা করা যাবে না। যদি তাদের ভুলটা দৃশ্যমান হয়, তারপরও ভর্ৎসনা বা পরিহাস করা যাবে না। বরং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ করতে হবে।

> “সাধারণ আলোচনা ছাড়া তুমি তাদের বিষয়ে বিতর্ক করবে না। তাদের অবস্থা সম্পর্কে তাদের কাউকে জিজ্ঞাসাবাদও করবে না।”
> *সূরা কাহফ : ২২*

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা আমাদের নির্দেশনা দিয়েছেন, যেন জ্ঞান, উপযুক্ত প্রমাণ এবং নিশ্চিত তথ্য ছাড়া কারও সঙ্গে তর্ক বা বিতর্কে না জড়াই। কোনো বিষয়ে জানা না থাকলে শুধু অনুমানের ভিত্তিতে তর্ক করতে হয়– যা প্রকারান্তরে সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছু হয় না। সেই সাথে, এ ধরনের উদ্দেশ্যহীন তর্কের কারণে পারস্পরিক সম্পর্কও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আরেকটি বিষয় হলো, সব সময় একই ধরনের কথা বলা উচিত। অনেক সময় দেখা যায়, একজন মানুষ কাউকে খুশি করার জন্য এক জায়গায় এক কথা বলে, আবার আরেক জায়গায় তাদের মতো করে কথা বলে। এরকম দ্বিমুখী আচরণ ও কথাবার্তা ইসলামে কঠোরভাবে নিষেধ।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, "দুমুখো মানুষই নিকৃষ্টতম মানুষ। আর দুমুখো হলো তারা, যারা এক দলের সঙ্গে এক রকম কথা বলে এবং অপর দলের সঙ্গে আরেক রকম কথা বলে।" *মুসলিম : ২৫২৬*

৫.৬ আল্লাহর নামে শপথ করা

কোনো একটি কথাকে সত্য প্রমাণ করতে গিয়ে অনেকেই অনেক ক্ষেত্রে আল্লাহর নামে কসম বা শপথ করে। এই বাজে অভ্যাসটি সমূলে পরিহার করা উচিত। আল্লাহর নাম এত হালকাভাবে ব্যবহার করা শোভন নয়। আল্লাহর নামে শপথ করা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> "তোমরা তোমাদের কসমসমূহকে পারস্পরিক কলহ দ্বন্দ্বের বাহানা হিসেবে ব্যবহার করো না। কেননা, এই শপথ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যদি পা ফসকে যায়, তা হলে তোমরা শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করবে।" *সূরা নাহল : ৯৪*

এ বিষয়ে রাসূল সা.-এর একটি হাদিস আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, "তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষ বিচারের দিনের ওপর ঈমান এনেছ, তারা হয় ভালো কিছু বলবে, না হয় চুপ থাকবে।" *বুখারি : ৬১৩৬*

৫.৭ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া

যদি আপনার কোনো সহকর্মীর কাছে কেউ কোনো প্রশ্নের উত্তর জানতে চায়, তবে আপনি সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করবেন না। বরং যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে প্রশ্ন করা না হচ্ছে, ততক্ষণ সংযত থাকুন। এটাই উত্তম পন্থা। এতে মানুষের আপনার মতামত জানার প্রতি আগ্রহ বাড়বে। একই সঙ্গে আপনার ব্যাপারে শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধি পাবে এবং সুধারণাও তৈরি হবে।

প্রখ্যাত তাবেয়ি মুজাহিদ ইবনে জাবের রহ. প্রায়শই লুকমান আ.-এর সেই সব অমৃত বচনের কথা স্মরণ করতেন, যা তিনি তাঁর সন্তানকে বলেছিলেন। লুকমান আ. বলেছিলেন, "যদি অন্য কাউকে কোনো প্রশ্ন করা হয় তা হলে তুমি তার উত্তর দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ো না। এমন আচরণ করো না যেন উত্তরটি দিতে পারলেই তোমাকে পুরস্কৃত করা হবে। বরং তোমার এরকম তাড়াহুড়ো করে উত্তর দেওয়ার কারণে, যাকে প্রশ্ন করা হলো, তিনি বিব্রতবোধ করবেন। সেই সাথে আশেপাশের অন্যদের কাছে তোমার এই অসৌজন্যমূলক আচরণের কারণে তুমি সমালোচিত হবে।"

হাম্বলি মাযহাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ ইবনে বাত্তা আল আকবারি রহ. বলেন, "আমি একবার উমর জাহিদ বাগদাদি রহ.-এর সান্নিধ্যে কিছু সময় থাকার সুযোগ পেয়েছিলাম। তাকে একটি বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। আমি নিজেই চটজলদি তাঁর উত্তর দিয়ে ফেলেছিলাম। তখন তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার এই কাজটি যে ঠিক হয়নি, তা কি বুঝতে পেরেছ?' তিনি ইঙ্গিতে আমাকে তাঁর অসন্তুষ্টির বিষয়টিও বুঝিয়ে দিলেন। ফলে আমি খুবই বিব্রত হয়েছিলাম।"

৫.৮ রাগ বা ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করা

মানুষের নিজেকে ধরে রাখতে না পারা কিংবা শিষ্টাচার বজায় না রাখা অথবা কারও সাথে কথা বলতে গিয়ে ধৈর্যচ্যুতি ঘটার একটি বড়ো কারণ হলো, রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা। আমরা যার ওপর বিরক্ত বা ক্ষুব্ধ থাকি, তার সঙ্গে কথা বলার সময় আদবের তোয়াক্কা করি না। ইসলাম এ ধরনের কঠোরতাকে সামাজিক বন্ধন ও ভ্রাতৃত্ববোধের সাথে সাংঘর্ষিক মনে করে। তাই রাসূল সা. সব সময় মুমিন বান্দাদের ক্রোধ বা রাগ নিয়ন্ত্রণ করার তাগিদ দিয়েছেন।

হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. থেকে বর্ণিত, "এক ব্যক্তি রাসূল সা.-এর কাছে এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিন, যা দ্বারা উপকার লাভ করতে পারি। আর অনেক কথা বলবেন না, তা হলে আমি মনে রাখতে পারব না।' রাসূল সা. তাকে বললেন, 'রাগ করা থেকে বিরত থাকবে'।" *বুখারি*

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "ওই ব্যক্তি বীর নয় যে অন্যকে ধরাশায়ী করে দেয়; বরং প্রকৃত বীর ওই ব্যক্তি যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।"

৫.৯ গিবত ও পরনিন্দা করা

রাসূল সা. গিবতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "গিবত হলো কোনো ব্যক্তি সমন্ধে এমন কিছু বলা যা সে পছন্দ করবে না।" কুরআন ও সুন্নাহর অসংখ্য স্থানে গিবত ও পরনিন্দা সম্পর্কে আমাদের বিরত থাকার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তারপরও আমরা কোনোভাবেই নিজেদের জিহ্বাকে সংযত রাখতে পারছি না। মূলত, মুসলিমদের মাঝে বিভাজন ও বিভক্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই শয়তান কাজ করে থাকে। তাই শয়তান নানাভাবে আমাদের সামনে গিবতের

বিষয়টিকে যৌক্তিক ও প্রাসঙ্গিক আকারে উপস্থাপন করতে চায়। ইসলাম মুমিনদের মনকে কাছাকাছি নিয়ে আসতে চায়, আর শয়তান শুধু দূরত্বই বাড়াতে চায়। আর এক্ষেত্রে গিবত হলো শয়তানের সবচেয়ে বড়ো হাতিয়ার।

যেহেতু মুসলিমরা আল্লাহর ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে শয়তানের ইবাদতে লিপ্ত হয়নি, তাই মুসলিমদের কতভাবে বিপথগামী করা যায়, বিভ্রান্ত করা যায় এবং আল্লাহর নির্দেশিত হিদায়াতের পথ থেকে সরিয়ে নেওয়া যায়, শয়তানের যাবতীয় তৎপরতাই সেভাবেই আবর্তিত হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> "শয়তান তোমাদের শত্রু; অতএব তাকে শত্রু হিসেবেই গ্রহণ করো। সে তার দলবলকে আহ্বান করে ভারী করার চেষ্টা করে, যেন তারা জাহান্নামি হয়।" *সূরা ফাতির : ৬*

শয়তান তার দলবলকে সংখ্যায় আরও বৃদ্ধি করার জন্য যে কৌশলগুলোর আশ্রয় নেয়, তার মধ্যে অন্যতম প্রধান দুটি কৌশল হলো গিবত ও পরচর্চা। আমাদের বুঝতে হবে, গিবত ও পরনিন্দার কারণে আমরা দুনিয়া ও আখিরাত দুটোতেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। এই মন্দ অভ্যাসটির চর্চা করার কারণে একদিকে দুনিয়াতে আমাদের পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের মধ্যে যেমন বিভাজন দেখা দিচ্ছে, সম্পর্ক খারাপ হচ্ছে, ঠিক তেমনিভাবে আখিরাতেও নিজেদের জন্য কঠিন শাস্তিকে নিশ্চিত করে ফেলছি। কুরআন মাজিদে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেন,

> "হে মুমিনগণ, তোমরা অতি ধারণা থেকে বিরত থাকো। নিশ্চয় কিছু ধারণা পাপ। আর গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণাই করো। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।" *সূরা হুজুরাত : ১২*

আবু বারযাহ আসলামি রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, "যেসব লোক যারা কেবল মুখেই ঈমান এনেছে কিন্তু ঈমান অন্তরে প্রবেশ করেনি! তোমরা মুসলিমদের গিবত করবে না ও দোষক্রটি তালাশ করবে না। কারণ, যারা তাদের দোষ খুঁজে বেড়াবে, আল্লাহও তাদের দোষ খুঁজবেন। আর আল্লাহ কারও দোষক্রটি তালাশ করলে তাকে তার ঘরের মধ্যেই অপদস্থ করে ছাড়বেন।" *আবু দাউদ : ৪৮৮০*

আল-মুসতাওরিদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, “যে ব্যক্তি অপর মুসলিমের গিবত করে এক লোকমা খাবে, আল্লাহ তাকে এজন্য জাহান্নাম হতে সমপরিমাণ খাওয়াবেন। আর যে ব্যক্তি অপর মুসলিমের দোষ বর্ণনার পোশাক পরবে আল্লাহ তাকে অনুরূপ জাহান্নামের পোশাক পরাবেন। আর যে ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কুৎসা রটিয়ে খ্যাতি ও প্রদর্শনীর স্তরে পৌঁছবে, মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে ওই খ্যাতি ও প্রদর্শনীর জায়গাতেই (জাহান্নামে) স্থান দেবেন।” *সুনানে আবু দাউদ : ৪৮৮১*

সামাজিকতার আদব

৬.১ বয়স্কদের প্রতি আন্তরিক হোন

বয়স্ক মানুষদের অবস্থানকে স্বীকৃতি দিন এবং তাদের যথাযথ সম্মান করুন। তাদের সাথে হাঁটার সময় একটু পেছনে থাকুন এবং আস্তে আস্তে হাঁটুন। এক্ষেত্রে তাদের ডানে দিকে থেকে হাঁটলেই উত্তম। কোথাও প্রবেশের সময় বয়োজ্যেষ্ঠদের আগে প্রবেশ করতে দিন। বের হওয়ার সময়ও তাদের অগ্রাধিকার দিন।

তাদের সাথে দেখা হলে সুন্দর করে সালাম দিন, অভিবাদন জানান। বয়োবৃদ্ধদের সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলতে গেলে আগে তাদেরকেই বলতে দিন। মনোযোগ দিয়ে তাদের কথা শুনুন। যদি আলোচনা করতে গিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত হয়, তবে নম্র ও শান্ত থাকুন, অন্তরে শ্রদ্ধাবোধ ধরে রাখুন এবং কণ্ঠস্বর নিচু রাখুন। বয়স্ক মানুষজনের প্রতি কখনোই শ্রদ্ধা হারাবেন না।

এই বিনম্রতা ধরে রাখার ব্যাপারে কিছু হাদিস ও ঘটনা মনে রাখা সহায়ক হবে। বুখারি ও মুসলিমের একটি হাদিস থেকে জানা যায়, একবার আবদুল্লাহ ইবনে সাহল রা. অপর এক সাহাবি মাহিসা বিন মাসউদ রা.-কে নিয়ে খাইবার অঞ্চলে গিয়েছিলেন। ফিরে আসার সময় আবদুল্লাহ রা.-কে শহিদ করা হয়। মাহিসা সেখান থেকে ফিরেই তার বড়ো ভাই হাওয়াইসা এবং শহিদ সাহাবির ভাই আবদুর রহমান ইবনে সাহলকে নিয়ে নবিজির কাছে যান। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই মাহিসা আগে কথা বলতে শুরু করেন। কিন্তু রাসূল সা. তাকে থামিয়ে দেন এবং বলেন, আগে বড়োদের কথা বলতে দাও। তারপর হাওয়াইসা আগে কথা বলেন এবং অতঃপর মাহিসা কথা বলার সুযোগ পান।

এক্ষত্রে আরও একটি ঘটনা দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায়। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, "একদিন রাসূল সা. উপস্থিত সাহাবিদেও উদ্দেশে বললেন, 'তোমরা আমাকে এমন একটা বৃক্ষের নাম বলো, যার দৃষ্টান্ত মুমিন

বান্দার মতো। তা সর্বদা তার প্রতিপালকের নির্দেশে খাদ্য দান করে, আর এর পাতাও ঝরে না।' তখন আমার মনে হলো যে এটি খেজুর গাছ। কিন্তু যেহেতু সে স্থানে আবু বকর ও উমর রা. উপস্থিত থেকেও কথা বলছিলেন না, তাই আমিও কথা বলা পছন্দ করিনি। তখন নবি সা. নিজেই বললেন, 'এটি খেজুর গাছ।' তারপর আমি যখন আমার আব্বার সাথে বেরিয়ে এলাম, তখন আমি বললাম, 'আব্বা! আমার মনেও খেয়াল এসেছিল যে, এটা নিশ্চয়ই খেজুর গাছ।' তিনি বললেন, 'তোমাকে তা বলতে কীসে বাধা দিয়েছিল? যদি তুমি তা বলতে, তা হলে এ কথা আমার কাছে এত এত ধন-সম্পদ পাওয়ার চেয়েও অধিক প্রিয় হতো, আমার সম্মানও বৃদ্ধি পেত।' আমি বললাম, 'আমাকে শুধু এ বিষয়টিই বাধা দিয়েছিল যে, আমি দেখলাম, আপনি ও আবু বকর রা. কেউ-ই কথা বলছেন না। তাই আমিও কথা বলা পছন্দ করলাম না'।"

ইমাম আহমাদ, হাকিম এবং তাবারানি রহ. উল্লেখ করেছেন, উবাদা ইবনে সামিত রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন, "যে বড়োদের শ্রদ্ধা করে না, সে আমার দলভুক্ত নয়।" এই হাদিসটি আরেকটি বর্ণনায় এভাবে এসেছে, "যে ব্যক্তি বয়স্কদের শ্রদ্ধা করে না এবং ছোটোদের স্নেহ করে না, সে আমার দলভুক্ত নয়।"

অল্পবয়সি হলেও কাউকে হেয় বা ছোটো করে দেখা ঠিক নয়। বুখারি শরিফে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনা জানা যায়, একবার উমর রা. তাঁর মজলিসে একটি আয়োজনে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবিদের সঙ্গে ইবনে আব্বাসকেও থাকার সুযোগ দেন। তাকে দেখে অনেকেই ইতস্ততবোধ করছিলেন। অনেকে এমনও বলছিলেন, সে তো আমাদের ছেলের বয়সি। আমাদের মাঝখানে তাকে ডাকা হলো কেন? সাইয়িদুনা উমর রা. জবাব দিলেন, সে উত্তম জ্ঞানী। তাই তাকে দাওয়াত করা হয়েছে।

আরেকটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, সাহাবিদের কেউ ছোটো হিসেবে ইবনে আব্বাসের উপস্থিতি নিয়ে আপত্তি তুললে উমর ফারুক রা. উপস্থিত সবাইকে সূরা ফাতিহা ব্যাখ্যা করতে বললেন। সবার মাঝে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. অধিকতর চমৎকারভাবে সূরা ফাতিহা ব্যাখ্যা করেছিলেন। ইবনে আব্বাস রা. পরে বলেন, আমার ধারণা, শুধু আমাদের অন্য সকলের সামনে যৎসামান্য জ্ঞানী হিসেবে প্রমাণ করার জন্যই উমর রা. সেদিন সেই প্রশ্নটি তুলেছিলেন।

৬.২ মুরব্বিদের নামাজের ইমামতি করার সুযোগ দিন

রাসূল সা. তাঁর সুন্নাহ দিয়ে তরুণ ও যুবকদের শিখিয়েছেন, যুবকদের দায়িত্ব হলো বয়স্ক মানুষদের সঙ্গ দেওয়া এবং সকল ক্ষেত্রে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেওয়া।

সহিহ বুখারি ও মুসলিমের উদ্ধৃত একটি হাদিসে সাহাবি মালিক বিন হুয়াইরিস রা. বলেন, "একবার আমিসহ কয়েকজন যুবকের একটি দল নবিজি সা.-এর সান্নিধ্যে টানা বিশ রাত অতিবাহিত করার সুযোগ পেয়েছিলাম। রাসূল সা. ছিলেন অতিশয় দয়ালু ও সহানুভূতিশীল। তিনি অনুভব করতেন, আমরা ঘরের স্বজনদের কথা ভাবছি। তাই তিনি আমাদের প্রশ্ন করতেন, তোমাদের ঘরে কে কে আছে? কাদেরকে রেখে তোমরা এখানে এসেছ? আমরা যখন তাকে জানালাম, আমাদের বাড়িতে কে কে আছে, তখন তিনি বললেন, "তোমরা বাড়ি ফিরে যাও। তাদের সাথে থাকো, তাদের ইসলাম শিক্ষা দাও এবং সৎ কাজের আদেশ দাও। যখন নামাজের সময় হবে, তাদের মধ্য থেকে কাউকে আজানের দায়িত্ব দাও। আর তোমাদের মধ্যে যিনি বয়সে বড়ো, তাকে ইমামতি করার সুযোগ দাও।"

এ ঘটনায় জানা যায়, রাসূল সা. বয়স্ক ও মুরব্বিদের নামাজে ইমামতি করার জন্য বলেছেন। যদি তারা জ্ঞানে ও শিক্ষায় যুবকদের সমানও হয়, তারপরও বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়ার কারণে তাদের এই সুযোগ দেওয়া উচিত। কিন্তু কোনো মানুষ যদি জ্ঞানে বয়োজেষ্ঠ্যদের চেয়েও বেশি যোগ্য হয়, তবে সেই জ্ঞানী ব্যক্তিকেই নামাজে ইমামতি করার দায়িত্ব দিতে হবে। কারণ, সম্মানের মানদণ্ড হিসেবে বয়সের তুলনায় জ্ঞানের অবস্থান অনেক ওপরে।

যদি কোনো বাড়িতে নামাজ আদায় করা হয়, তবে যিনি বাড়ির মালিক, তারই ইমামতি করার হক। যদি তিনি চান তবে জ্ঞান বা বয়সের দিক থেকে সিনিয়র এমন মেহমানকে নামাজ পড়ানোর জন্য অনুরোধ করতে পারেন। কিন্তু যদি উক্ত মেহমান ইমামতি করতে অনীহা প্রকাশ করেন, তবে আয়োজক ব্যক্তিরই নামাজ পড়ানো উচিত।

ইমাম আহমাদ রহ. তাঁর মুসনাদে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। একবার প্রখ্যাত সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. আরেকজন বিশিষ্ট সাহাবি আবু মুসা আশআরি রা.-এর বাড়িতে বেড়াতে যান। এমন সময় নামাজের ওয়াক্ত হয়। আবু মুসা রা. তখন ইবনে মাসউদকে বলেন, 'আপনি নামাজ পড়ান।

কারণ, আপনি আমার চেয়ে বয়সে বড়ো আবার জ্ঞানেও বড়ো।' ইবনে মাসউদ রা. জবাবে বলেন, 'না, আপনি নামাজ পড়ান। কারণ, এটি আপনার বাড়ি।' এরপর আবু মুসা রা. আর কোনো কথা না বাড়িয়ে নামাজে ইমামতি করেন।

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববি রহ. বলেন, "এই হাদিস থেকে বোঝা যায়–যদি কোনো অনুষ্ঠানে অধিক জ্ঞানী বা ধার্মিক লোকও থাকে, তারপরও ইমামতি করার জন্য উক্ত বাড়ির মালিক বা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বেশি অগ্রাধিকার পাবেন। এই অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি নিজে আগ্রহী না হয়ে অন্য কাউকে সামনে এগিয়ে দেয়, কেবল তখনই অন্য ব্যক্তিরা নামাজ পড়াবেন।"

নতুন কোনো স্থানে গেলেও স্থানীয় লোকদের দিয়েই নামাজের ইমামতি করানো বাঞ্ছনীয়। মালিক ইবনুল হুয়াইরিস রা.-কে একবার ইমামতি করতে বলা হলে তিনি বললেন, 'তোমরা নিজেদের মধ্য হতে একজনকে ইমামতি করতে বলো। আমি তোমাদের ইমামতি না করার কারণ সম্পর্কে তোমাদের একটি হাদিস শোনাব। আমি রাসূলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছি, "কেউ কোনো কওমের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে সে যেন তাদের ইমামতি না করে; বরং তাদের মধ্য হতেই যেন কেউ ইমামতি করে।" *আবু দাউদ : ৫৯৬*

৬.৩ বয়স্ক মানুষের সঙ্গে পথচলার আদব

প্রখ্যাত ফকিহ আলী বিন মুবারাক আল কারখি ছিলেন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ.-এর একজন ছাত্র। বয়স্ক মানুষদের সঙ্গে কীভাবে হাঁটা যায় বা চলাচল করা যায়, সেই প্রসঙ্গে আলী বিন মুবারাক আল কারখি রহ.-এর একটি উক্তি এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে। "একদিন আমি বিচারপতি আবু ইয়ালার সঙ্গে হাঁটছিলাম। তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'যদি তুমি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে গিয়ে কারও সঙ্গে হাঁটো বা হাঁটতে চাও, তবে তুমি কোনদিক দিয়ে হাঁটো?' আমি বললাম, 'জানি না, আমি তো কখনও এটা খেয়ালও করিনি।' তখন তিনি আমাকে বললেন, 'সব সময় মুরব্বি ব্যক্তির ডান পাশ দিয়ে হাঁটবে। তাকে নামাজে ইমামতি করার সুযোগ দেবে। তাঁর বাম পাশ খালি রাখবে, যাতে তিনি প্রয়োজনে থুতু ফেলতে পারেন বা নোংরা-ময়লা বা আবর্জনা এড়িয়ে চলতে পারেন'।"

কয়েকজন মুসলিম শিক্ষাবিদ বন্ধুদের মধ্যে প্রায়ই একটি মজার ঘটনা ঘটত। তাদের মধ্যে ছিলেন বিচারপতি আহমাদ ইবনে উমার বিন সুরিয়াহ, ফকিহ মুহাম্মাদ বিন দাউদ জাহেরি এবং ভাষাবিদ নাফতউইহ। একবার তারা

একসাথে হাঁটতে হাঁটতে খুব সরু গলির সামনে চলে এলেন। প্রত্যেকেই আগে যেতে চাইছিলেন। তখন ইবনে উমার সুরিয়াহ বললেন, 'সরু গলি সর্বদা অসৌজন্যমূলক আচরণ উসকে দেয়।' ইবনে দাউদ এই কথার জবাবে বলেন, 'আমাদের অবস্থা দেখেও তা-ই মনে হচ্ছে।' আর সবশেষে নাফতউইহ বলেন, 'যতক্ষণ বন্ধুত্ব টিকে আছে, ততক্ষণ লৌকিক সৌজন্যতার কোনো স্থান নেই'।"

এই গল্প থেকে এটা জানা যায় না যে, উপরোক্ত তিনজনের মধ্যে কে আগে সেই সরু গলি পার হয়েছিলেন; খুব সম্ভবত আহমাদ ইবনে সুরিয়াহ। কারণ, তিনি ছিলেন বিচারপতি, প্রখ্যাত ইমাম এবং অন্য দুই সঙ্গীর তুলনায় তাঁর সামাজিক অবস্থানও ছিল উর্ধ্বে। তাঁর উপরোক্ত মন্তব্য তথা 'সরু গলি সব সময় অসৌজন্যমূলক আচরণ উসকে দেয়' প্রমাণ করে, তিনি আগে যাওয়ার জন্য পরোক্ষভাবে ক্ষমাই চাইছিলেন। নিজের বিনম্র মানসিকতার কারণেই তিনি এভাবে ক্ষমা চেয়েছেন। অন্যরা কেউ আগে গেলে তিনি হয়তো এভাবে বলতেন না। আবার ইবনে দাউদ ও নাফতউইহের মন্তব্যে প্রমাণ হয়, তাঁরাও বন্ধুবৎসল হৃদ্যতার সম্পর্কের কারণে আগে যেতে পারেন। তবে যেই যাক না কেন, যেভাবে তারা মন্তব্য করেছেন এবং একে অপরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন, তা চমৎকার বন্ধুত্বেও নিদর্শন ও শিক্ষণীয়।

৬.৪ বয়স্ক ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দান

অন্য সবার আগে সবকিছুতে বয়স্ক বা মুরব্বি ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। কোনো আয়োজনে খাবার বিতরণ করার সময়ও আগে মুরব্বিদের দিতে হবে। তাদের দেওয়া হয়ে গেলে, তারপর হাতের ডান পাশ থেকে বিতরণ শুরু করতে হবে। রাসূল সা. নিজেও এভাবেই খাবার বিতরণ করতেন। তা ছাড়া ওপরে উল্লেখিত হাদিস থেকেও বয়স্ক ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়ে শিক্ষা পাওয়া যায়।

ইমাম মুসলিম রহ. তাঁর সহিহ মুসলিমের আদব ও শিষ্টাচার অধ্যায়ে খাওয়া ও পান করার নিয়ম প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেন, হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রা. বলেন, "আমরা রাসূল সা.-এর সঙ্গে যখন যেখানেই দাওয়াতে যেতাম, তাঁর আগে কখনোই খাবার স্পর্শ করতাম না।"

এই আদবের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে ইমাম নববি রহ. *রিয়াদুস সালিহিন* গ্রন্থে বেশকিছু হাদিস উল্লেখ করেছেন। সেইসঙ্গে জ্ঞানী, মুরব্বি এবং শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা করার নিয়ম বিষয়ে গোটা একটি অধ্যায় সন্নিবেশিত করেছেন।

ব্যক্তিগতভাবেও তিনি সব সময় মুরব্বি ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দিতেন। তাদের বসার জন্য ভালো আসন দিতেন। সর্ববস্থায় তাদের সম্মান ধরে রাখার চেষ্টা করতেন। *রিয়াদুস সালিহিন* গ্রন্থ থেকে এ সংক্রান্ত কিছু হাদিস নিচে উল্লেখ করছি।

সহিহ মুসলিম-এ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী ও পরিণত, তারা আমার পেছনে দাঁড়াবে। তারপর যারা অপেক্ষাকৃত কম জ্ঞানী তারা, তার থেকেও যারা কম জানেন তারা এর পেছনে। এভাবে ক্রমানুসারে তোমরা কাতারবদ্ধ হবে।"

সুনানে আবু দাউদ-এ আবু মুসা আশআরি রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "আল্লাহর প্রতি সম্মান দেখানোর একটি উপায় হলো বয়স্ক ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা করা। বিশেষ করে যাদের চুল পেকে সাদা হয়ে গেছে, কিংবা যারা নিয়মিত কুরআন অধ্যয়ন করেন এবং যারা ন্যায়পরায়ণ শাসক, তাদেরকে সব সময় শ্রদ্ধা করা।"

আদাবুল মুফরাদ-এ ইমাম বুখারি উদ্ধৃত করেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "যে ব্যক্তির ছোটোদের প্রতি স্নেহবোধ নেই এবং যে বড়োদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন নয়, সে আমার দলভুক্ত নয়।"

বয়স্ক ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই রাসূল সা. আল্লাহকে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের একটি উপায় হিসেবে এই আদব উল্লেখ করেছেন। এই আদবকে অবমূল্যায়ন ও অবহেলা করা অনুচিত। ন্যায়পরায়ণ শাসককে সর্বাগ্রে সম্মান করার বিধান রেখে একজন প্রসিদ্ধ কবি আটটি নিয়ম প্রণয়ন করেছিলেন। তার মতে– যারা এই আটটি অসৌজন্যমূলক আচরণ করবে, তাদের শাস্তি প্রদান করা উচিত। এগুলো হলো :

১. একজন ন্যায়পরায়ণ শাসককে অসম্মান ও অশ্রদ্ধা করা।
২. কারও অনুমতি না নিয়ে তার বাড়িতে প্রবেশ করা।
৩. অন্যের বাড়িতে গিয়ে খবরদারি করা।
৪. বয়োবৃদ্ধরা থাকার পরও কোনো অনুষ্ঠানে গিয়ে সবচেয়ে ভালো আসন দখল করা।
৫. কারও সঙ্গে কোনো বিষয়ে আলোচনা করার সময় একগুঁয়েমি করা।
৬. দুজন ব্যক্তির মাঝখানে হস্তক্ষেপ করা।
৭. অসৎ চরিত্রের কারও কাছ থেকে দান বা সাহায্য প্রত্যাশা করা এবং
৮. শত্রুদের থেকে আনুকূল্য বা সুবিধাদি কামনা করা।

সুনানে আবু দাউদ এবং *মুসতাদরাকে হাকিম* হাদিস গ্রন্থে মাইমুন ইবনে আবু শাবিব থেকে বর্ণিত। "একবার এক ভিক্ষুক উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রা.-এর কাছে কিছু খাবার চাইল। মা আয়িশা রা. তাকে এক টুকরো শুকনো রুটি দিলেন। একটু পর আরেক ব্যক্তি, যিনি একটু মার্জিত; তিনি এসেও খাবার চাইলেন। মা আয়িশা রা. তাকে বসিয়ে খাবার খেতে দেন। যখন তাকে প্রশ্ন করা হলো, আপনি কেন দুই রকম মানুষের সাথে দুই রকম আচরণ করলেন? তিনি উত্তর দিলেন, রাসূল সা. আমাদের বলে গেছেন, প্রত্যেকের সাথে তার মানদণ্ড অনুযায়ী আচরণ করো।" *সুনানে আবু দাউদ : ৪৮৪০*

ইমাম নববি রহ. তাঁর এই অধ্যায়টি শেষ করেন বুখারি ও মুসলিম শরিফে উল্লিখিত একটি হাদিস দিয়ে। সামুরা ইবনে জুনদুব রা. বলেন, "রাসূল সা.-এর জীবদ্দশায় যদিও আমি অল্প বয়সি ছিলাম, তারপরও সর্বদা খেয়াল করতাম তিনি কী বলেন। তিনি কিছু বললেই তা মুখস্থ করে নিতাম। সেই জ্ঞানের শক্তিতে এমন কোনো জায়গা নেই, যেখানে আমি আমার জানা তথ্যগুলো প্রচার করি না। তবে শুধু সেখানেই নিজেকে সংযত করি, যেখানে নিজের চেয়ে বেশি বয়সি কাউকে পাই।"

রাসূল সা.-এর সুন্নাত হলো, যেকোনো কিছু শুরু করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ধাপগুলো অবলম্বন করা। প্রথমে বয়স, তারপর জ্ঞান, এরপর সামাজিক মর্যাদা, বংশ মর্যাদা, জিহাদে অংশগ্রহণকারী বীর সেনা, ঔদার্য্য বা এ ধরনের মানবিক গুণাবলি ধারণ করা ইত্যাদি। অন্যদিকে, রাসূল সা.-এর আতিথেয়তার যে সুন্নাত তাতে দেখা যায়, তিনি মেহমানদারি বা আতিথেয়তা করতে গিয়ে সবার আগে সম্মান দিতেন বয়োজ্যেষ্ঠদের, তারপর ডান দিক থেকে একে একে সবাইকে খাবার দিতেন। আবার অনেক সময় সবচেয়ে বেশি মহৎ গুণের অধিকারী যিনি, তাকে দিয়েই খাবার বিতরণ শুরু করা হতো।

অনেক সময় কিছু মানুষ হাদিসের অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পারে না এবং দাবি করে, ডানপাশে যে বসবে, তাকে দিয়েই শুরু করাটা সুন্নাত; যে মানের লোকই হোক না কেন। তারা রাসূল সা.-এর ডান দিক থেকে খাবার বিতরণসংক্রান্ত হাদিসের আলোকে এই মতটি ধারণ করেন। কিন্তু এটি তখনই করা দরকার, যখন কোনো একটি গ্রুপে বা দলে সবাই প্রায় কাছাকাছি বা একই মানের চারিত্রিক গুণ সম্পন্ন হয় বা একই মর্যাদা বা বয়সের হয়। কিন্তু সেখানেও যদি এমন কেউ থাকেন যার বয়স বেশি, তবে তাকে দিয়েই মেহমানদারি শুরু করা হবে সুন্নাত।

ইবনে রুশদ রহ. তাঁর গ্রন্থ *আল বায়ান ওয়াত তাহসিল*-এ বলেন, "যারা উপস্থিত তাদের সকলের মর্যাদা যদি একই হয়, তবে মেহমানদারি ডান দিক থেকে শুরু করা যায়। যদি সেখানে কোনো বয়স্ক লোক বা জ্ঞানী ব্যক্তি থাকে, তবে তাকে দিয়ে আতিথেয়তা শুরু করাই শিষ্টাচারের দাবি। তারপর সেই ব্যক্তির ডান পাশ থেকে চক্রাকারে বাকিদের খাবার পৌঁছে দেওয়া হবে।"

বাম দিক দিয়ে খাবার বিতরণ করা যাবে না। তবে যদি বাম দিকে কোনো উচ্চ মর্যাদার লোক থাকে, আগে তাকে খাবার দিতে হবে। কিন্তু সেখান থেকে বামদিকে আর খাবার বিতরণ করা যাবে না। ডানদিকের লোকেরা যদি আগে বামদিকে বসা মানুষকে খাবার সরবরাহ করতে বলে, তবে সে ক্ষেত্রে ভিন্ন কথা। রাসূল সা. একবার এমন এক মজলিসে বসলেন, যেখানে তার বাম দিকে মুরব্বি ব্যক্তি আর ডানে একজন যুবক বসেছিল। রাসূল সা.-কে পানীয় দেওয়া হলো এবং তিনি তা পান করলেন। এরপর তিনি তার ডানে বসা যুবককে বললেন, 'তুমি যদি অনুমতি দাও, তবে আমি বামে বসা মুরব্বিদের আগে এই পানীয়টুকু দিতে পারি।' যুবক উত্তরে বলল, 'আল্লাহর কসম! আমি কখনোই আপনার হাত থেকে খাবার পাওয়ার সুযোগ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে পারব না।' তখন রাসূল সা. সন্তুষ্টচিত্তে ডানে বসা ওই যুবককেই অন্য সবার আগে পানীয় পরিবেশন করলেন।" *বুখারি : ৫২৬০*

আল মিনায়ি রহ. এই হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, "সুন্নাত হলো, সবার আগে বয়োজ্যেষ্ঠ ও সম্মানীয় লোকদের খাবার ও পানীয় সরবরাহ করা। এরপর তার ডান দিকে যারা বসেছে, তাদের মাঝে খাবার পরিবেশন করতে হবে। প্রথম যে মুরব্বি খাবার পাবেন, তার বামে যদি শ্রদ্ধাভাজন লোক থাকে তারপরও আগে ডান দিকেই খাবার সরবরাহ করতে হবে।"

সহিহ মুসলিমের আরেকটি হাদিসে সবার আগে সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে খাবার দেওয়া এবং তারপর ডানে বসা ব্যক্তিদের খাবার পরিবেশনের ব্যাপারে সুপারিশ করা হয়েছে। "একবার রাসূল সা. আমার বাবাকে দেখতে এসেছিলেন। আমরা নবিজিকে খেজুর ও মাখন দিয়ে তৈরি করা খাবার খেতে দিলাম। তারপর তাকে খেজুর খেতে দিলাম। তিনি খেজুর খেয়ে বিচিগুলো আস্তে করে অন্য পাত্রে ফেলছিলেন। খেজুরের বিচি আলাদা করা এবং তা ফেলার জন্য তিনি নিজের মধ্যমা ও তর্জনী আঙুল ব্যবহার করছিলেন। এরপর তাকে আমরা পানি দিলাম। তিনি নিজে পানি পান করলেন এবং তারপর তার ডানে বসা ব্যক্তিকে খেতে দিলেন।"

এই হাদিসটি থেকে বোঝা যায়, রাসূল সা. যেহেতু সবচেয়ে সম্মানিত, তাই সব খাবার প্রথম তাঁকেই সরবরাহ করা হয়। আর রাসূল সা. নিজে খেয়ে তারপর তাঁর ডানে বসা ব্যক্তিদের খাবার সরবরাহ করতেন। এই হাদিসটি থেকে আরও বোঝা যায়, রাসূল সা. নিজে থেকে হয়তো পানীয় বা কিছু খেতে চাননি। কিন্তু মেজবান যখনই যা এনেছেন, সবার আগে তিনি নবিজিকেই তা দিয়েছেন।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, অনেক সময় কিছু মানুষ ঈমানি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং মানবতাবোধের কারণে মেহমান ও মুসাফিরদের অনেক বেশি আপ্যায়ন করে। পরবর্তী সময়ে যদি জানা যায়, মুসাফির আসলে প্রসিদ্ধ কোনো ব্যক্তি, তবে মেজবান তার যত্ন ও আন্তরিকতার মাত্রা যেন আরও বাড়িয়ে দেয়। নিঃসন্দেহে এটা দোষণীয় নয়। বরং অন্তর্নিহিত সত্যনিষ্ঠ চেতনা এবং ঈমানের কারণেই মানুষের মনে এ ধরনের ইতিবাচক অনুভূতির জন্ম হয়।

অতএব, এক কথায় বলতে গেলে, যদি কোনো আয়োজনে উপস্থিত ব্যক্তিদের সবাই একই মানের হয়, তবে ডান দিক দিয়ে শুরু করাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যদি সেখানে সম্মানীয় কোনো ব্যক্তি থাকেন, তবে তাকে দিয়েই আতিথেয়তা শুরু করা উচিত।

তাই বলে যদি আমরা গণহারে ডান দিক দিয়েই খাবার বিতরণ শুরু করি, তবে দেখা যাবে– বামপাশে হয়তো কোনো প্রখ্যাত ব্যক্তি, সম্মানিত কোনো আলিম বা জ্ঞানী ব্যক্তি, মুরব্বি, কোনো অভিভাবক, কারও দাদা বা চাচা উপস্থিত আছেন। তিনি হয়তো বামে বসায় খাবার পাওয়ার ক্ষেত্রে পিছিয়ে যাবেন বা অসম্মানিত হবেন। আবার এমনও হতে পারে, মুরব্বি হয়তো ডানপাশেই বসেছেন, কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম বয়সি দশজন ব্যক্তির পর। ওই দশজনকে পর্যায়ক্রমে দিয়ে তারপর তাকে খাবার পরিবেশন করাটাও অসৌজন্যতা।

তবে কেউ যদি আগে পানি খেতে চায় কিংবা কারও যদি কোনো অস্বস্তিবোধ হয় এবং সেই কারণে যদি তিনি একটু পানি খেতে চান, তা হলে অন্য সবার আগে তাকে পানি দেওয়া উচিত। এক্ষেত্রে বয়স বা সামাজিক মান-মর্যাদাকে বিবেচনায় নেওয়ার সুযোগ নেই। কিন্তু যদি একজন ব্যক্তি পানি চাইলেন, তাকে পানি দেওয়া হলো। অতঃপর তিনি দেখলেন, তার চেয়ে বয়স্ক কারও পানির আরও বেশি প্রয়োজন। তা হলে সেক্ষেত্রেও তিনি নিজের দাবি ছেড়ে দিয়ে সেই বয়স্ক মানুষটিকে আগে পানি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করতে পারেন। ইসলামিক

শিষ্টাচারের দাবি হলো, যদি সম্ভব হয় তা হলে নিজের হক বা দাবি ছেড়ে দিয়ে বরং অন্যের চাহিদার প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া। এরকম করতে পারলে বোঝা যায়, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিঃস্বার্থ মানসিকতার। আর এরকম পরোপকারী আচরণ করতে পারলে ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদা অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়।

বয়স্ক মানুষকে সম্মান করা, আনুগত্য করা এবং অগ্রাধিকার দেওয়া আরবদের পুরোনো সংস্কৃতি। এক্ষেত্রে সাহাবি কায়েস বিন আসেম আত তামিমি রা.-এর একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করা যায়। নিজের মৃত্যুসজ্জায় কায়েস রা. তাঁর সন্তানদের নসিহত করেন, যাতে তারা ইসলামি আচরণে সমৃদ্ধ প্রবীণ ব্যক্তি ও চরিত্রবান নেতাদের আনুগত্য করে। কারণ, এসব প্রবীণ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের থেকেই মূল্যবান পরামর্শ এবং জ্ঞাননির্ভর দিক-নির্দেশনা পাওয়া যাবে।

এই মহান সাহাবি কায়েস বিন আসেম আত তামিমি রা. ছিলেন বনু তামিমের প্রসিদ্ধ নেতা। তিনি অনুপম বক্তব্যশৈলীর জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর এই গুণের জন্য রাসূল সা. তাকে 'মরুভূমির বাসিন্দাদের উসতায' উপাধি প্রদান করেছিলেন। কায়েস বিন আসেম রা. ছিলেন খুবই জ্ঞানী ও সদাচারী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। হিজরি ৯ম বর্ষে একবার তিনি বনু তামিমের লোকজন নিয়ে মদিনায় এসেছিলেন। তাকে দেখেই রাসূল সা. বললেন, এই মানুষটি হলো 'মরুভূমির বাসিন্দাদের উসতায'। কায়েস বিন আসেম রা. তাঁর জীবনের শেষ বছরগুলো বসরাতে অতিবাহিত করেন এবং সেখানেই ২০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

মানুষ হিসেবে কায়েস বিন আসেম রা. ছিলেন খুবই ধৈর্যশীল। বিখ্যাত আরব সাধক আহনাফ বিন কায়েসকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'আপনি কার থেকে সবরের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন?' তিনি উত্তর দেন, 'কায়েস বিন আসেমের কাছ থেকে। একবার আমি কায়েস রা.-কে তাঁর বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে আগত অতিথি ও গোত্রের লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছিলাম। সেই সময় এক ব্যক্তিকে দড়িতে বেঁধে একটি মৃতদেহসহ তাঁর সামনে নিয়ে আসে। কায়েস রা.-কে বলা হলো, 'এই আটক ব্যক্তিকে দেখুন, আপনার ভাতিজা। আর সে আপনার ছেলেকে হত্যা করেছে।'

নিজের ছেলেকে হত্যা করার কথা শুনেও কায়েস বিন আসেম রা. শান্ত থাকলেন। তিনি মেহমানদের সাথে ধীরে-সুস্থে কথোপকথন শেষ করলেন। তারপর ভ্রাতুষ্পুত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি জঘন্যতম অপরাধ করেছ।

তুমি তোমার রবের সাথে অন্যায় করেছ। আপন চাচাতো ভাইকে হত্যা করেছ। প্রকৃতপক্ষে তুমি নিজেকে হত্যা করেছ এবং নিজ গোত্রকে দুর্বল করে দিয়েছ।'

তারপর তিনি তাঁর আরেক পুত্রকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, 'যাও, তোমার চাচাতো ভাইয়ের কাছে। ওর বাঁধন খুলে দাও। আর তোমার সহোদরকে দাফন করো। তারপর তোমার মায়ের কাছে যাও আর তাঁর সন্তানকে হত্যার ক্ষতিপূরণ হিসেবে একশোটি উট দেওয়ার ব্যবস্থা করো।'

ইমাম হাসান বসরি রহ. সরাসরি কায়েস বিন আসেম রা.-এর কাছে দ্বীনি শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং মৃত্যুসজ্জায় তিনি তাঁর শিয়রে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন, কায়েস বিন আসেম রা. জীবন সায়াহ্নে তাঁর ৩৩ জন সন্তান-সন্ততি ও নাতি-নাতনিকে ডেকে নিম্নোক্ত পরামর্শ দেন–

"হে আমার উত্তরাধিকারীরা! আল্লাহকে ভয় করো। আর আমি যা বলছি তা মনে রেখো। আর কেউ তোমাদের এত আন্তরিকভাবে এই পরামর্শগুলো দেবে না। আমার মৃত্যুর পর তোমাদের মধ্যে যারা বয়স্ক, তাদের মধ্য থেকেই কাউকে তোমরা নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে। যদি তোমরা তোমাদের পিতার স্মৃতির ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে চাও, তবে অল্প বয়সি কাউকে নেতা নির্বাচন করো না। যদি তোমরা অপেক্ষাকৃত কমবয়সি কাউকে নেতা বানাও, তবে তোমরা যে কেবল মুরব্বিদেরকেই অপমান করবে তা-ই নয়; বরং অন্যরাও তোমাদের অবমূল্যায়ন করবে। আমার মৃত্যুর পর চিৎকার করে কেঁদো না। আমি শুনেছি, নবিজি সা. এভাবে কান্না করতে নিষেধ করেছেন। অতটুকু পরিমাণ সম্পদের পেছনে ছোটো, যা মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্য দরকার হয়। আবার তাই বলে সম্পদের জন্য ভিক্ষাবৃত্তিতে নেমো না; এটা জঘন্যতম কর্ম। যদি কোনো খারাপ কাজ করতে একবারের জন্যও ভালো লাগে, তারপরও তা আর করো না। কারণ, পরবর্তী সময়ে সেই খারাপ কাজটি তোমার ভেতরে থাকা ভালো অনুভূতিগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে দেবে।" *আদাবুল মুফরাদ : ৩৬২*

এরপর কায়েস রা. তাঁর তিরের তুনীটি চাইলেন। তুনী নিয়ে আসার পর তিনি তাঁর বড়ো ছেলে আলীকে একটি তির ভাঙতে বললেন। বড়ো ছেলে তা সহজেই ভেঙে ফেললেন। এরপর তিনি আরও একটি তির ভাঙতে বললেন। এভাবে তাঁর নির্দেশে তুনীরে থাকা ৩০টি তির পর্যায়ক্রমে ভেঙে ফেলা হলো।

এরপর কায়েস রা. ৩০টি তিরকে দড়ি দিয়ে একসাথে বেঁধে ফেলতে বললেন। তা-ই করা হলো। এবার বাঁধনে থাকা তিরগুলোকে ভেঙে ফেলতে বলা হলো। কিন্তু এতগুলো তির একসাথে বাঁধা পড়ায় কেউ-ই আর তা ভাঙতে পারছিল না। তখন কায়েস রা. তাঁর সন্তানদের বললেন, "এই তিরগুলোর মতোই তোমাদের পরিণতি। অর্থাৎ যদি তোমরা একত্রে থাকো তবেই তোমরা শক্তিশালী থাকবে আর বিচ্ছিন্ন হলে দুর্বল হয়ে পড়বে।"

৬.৫ পিতা-মাতার সাথে আদব

পিতা ও মাতা জীবিত থাকলে তাদের আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করুন। আপনার জন্য তারাই সবচেয়ে বেশি নিয়ামতের উৎস। এক ব্যক্তি নবিজি সা.-কে প্রশ্ন করল, 'হে আল্লাহর রাসূল! কে আমার সদাচরণের সবচেয়ে বেশি হকদার?' রাসূল সা. উত্তরে বললেন, 'তোমার মা।' 'এরপর কে?' 'তোমার মা।' 'এরপর?' 'তোমার মা।' 'এরপর কে?' 'তোমার বাবা। অতঃপর অন্যান্য নিকটাত্মীয়-স্বজন'।" *সহিহ মুসলিম* : ৬২৬৯

ইমাম বুখারি রহ. তাঁর *আদাবুল মুফরাদ* গ্রন্থে হিশাম বিন উরওয়ার রহ.-এর একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। উরওয়া রহ. পুত্র হিশামকে জানিয়েছেন যে, "একবার আবু হুরায়রা রা. দেখতে পেলেন, এক ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে থাকা লোকটিকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। আবু হুরায়রা রা. কাছে গিয়ে লোকটিকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি যাকে পেছনে ফেলে এলে, তিনি তোমার কে হয়?' লোকটি উত্তর দিলো, 'তিনি আমার বাবা।' আবু হুরায়রা রা. বললেন, 'তাকে পেছনে রেখে কখনোই সামনে যেয়ো না। কোথাও গেলে তিনি না বসা পর্যন্ত তুমি আসন গ্রহণ করো না, আর কখনোই তাকে নাম ধরে ডেকো না'।"

ইমাম মালিক রহ.-এর ছাত্র আবদুর রহমান ইবনে কাসিম আল উতাকি আল মাসরি বলেন, "একবার ইমাম মালিক নিজের সংকলিত *মুয়াত্তা* পড়ছিলেন। হঠাৎ করেই তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। খানিক সময় দাঁড়িয়ে থেকে আবার বসলেন। আমি তাঁর এমন আচরণের কারণ জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, 'আমার মা এসে আমার কাছে কিছু জানতে চেয়েছিলেন। তিনি দাঁড়িয়েছিলেন, তাই আমিও দাঁড়িয়েছিলাম। তিনি চলে যাওয়ার পর আমি আবার বসেছি'।"

তাবেয়ি তাউস বিন কিসান রহ. বলেন, "চার ধরনের মানুষকে শ্রদ্ধা করা সুন্নাতের অপরিহার্য দাবি– জ্ঞানী, বয়স্ক, নেতা ও পিতা। পিতাকে নাম ধরে ডাকা হলে তা রীতিমতো ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ বলেই মনে করা হয়।"

ইমাম ইবনে আবদুল বার রহ. তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *ফিকহুল কাফি*-র শেষাংশে উল্লেখ করেছেন, "পিতামাতার প্রতি দরদি হওয়া বাধ্যতামূলক কর্তব্য। আর আল্লাহর রহমতে কাজটি বেশ সহজ। তাদের প্রতি দয়ালু হওয়ার অর্থ হলো বিনয়ী হওয়া, সুন্দর করে কথা বলা, তাদের প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধার চোখে দৃষ্টি দেওয়া, মৃদু স্বরে কথা বলা; যদি তারা কানে কম শোনে তবে ভিন্ন কথা। তবে তাদের সাথে কখনোই উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা যাবে না। সন্তানের সম্পদেও তাদের পূর্ণ অধিকার প্রদান করতে হবে। তাদের সর্বোত্তম খাবারের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করতে হবে।"

সন্তান কখনোই পিতামাতার আগে আগে হাঁটবে না। কোনো বিষয়েই সন্তান পিতামাতার আগে কথা বলবে না। সন্তানরা সর্বাত্মক চেষ্টা করবে, যাতে তাদের কোনো আচরণে মা-বাবা বিব্রত না হন। মা-বাবাকে খুশি করার জন্য তারা আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাবে। পিতামাতার জীবনকে উপভোগ্য ও শান্তিময় করা সন্তানের জন্য নেক আমলের সমতুল্য। পিতামাতা ডাকলে উচিত যতদ্রুত সম্ভব সাড়া দেওয়া। এমনকি যদি সন্তান একা একা নামাজ পড়ে আর ঠিক তখনই মা-বাবা কেউ ডেকে বসেন, তবে সন্তানের উচিত নামাজ সংক্ষেপ করা। বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলার সময় সন্তানের শুধু ভালো কথাই বলা উচিত।

অন্যদিকে, পিতামাতার করণীয় হলো, সন্তানের দায়িত্ব পালনের প্রক্রিয়া সহজ করে দেওয়া। সন্তানদের প্রতি দরদি হওয়া, আচরণে ভারসাম্য বজায় রাখা, ন্যায়বিচার করা এবং তাদের প্রতি উদারতা প্রকাশ করা। তবে বাবা-মা কিংবা সন্তান কেউ-ই নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারবে না, যদি না আল্লাহ সাহায্য না করেন। তাই আল্লাহর রহম ও সাহায্য পাওয়ার জন্য সব সময় সচেষ্ট থাকতে হবে।

এমনও হতে পারে, আপনি অনেক কঠিন পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন, তারপরও পিতামাতার হক আদায় করার কথা ভুলে যাবেন না। আবার বাবা-মায়ের প্রতি সদাচরণ করতে গিয়েও নানা ধরনের বিড়ম্বনার শিকার হতে পারেন। কিন্তু তারপরও এই দায়িত্ব থেকে সরে আসা যাবে না। কুরআন আল্লাহ মাজিদে তায়ালা বলেছেন,

> "তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলো না। তাদের ধমক দিয়ো না

বরং সব সময় আদবের সাথে কথা বলো। তাদের সামনে ভালোবাসার সাথে, নম্রভাবে আচরণ করো এবং বলো, 'হে আমার রব! তাদের উভয়ের প্রতি রহম করো, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন'।" সূরা ইসরা : ২৩-২৪

মনে রাখা উচিত, প্রত্যেকেই নিজের অবস্থানে সবচেয়ে ভালো থাকতে চায়। নিজের সম্মান ও জনপ্রিয়তা নিয়েই বাঁচতে চায়। অন্য কেউ তার চেয়ে ভালো অবস্থানে চলে গেলে মানুষ অনেকসময় তা সহজভাবে নিতে পারে না। দুনিয়াতে কেবল পিতা-মাতাই একমাত্র সত্তা, যারা আন্তরিকভাবে চায় সন্তানরা যেন তাদের চেয়েও ভালো অবস্থানে যায় এবং ভালোভাবে থাকে। তাই অন্য সবার তুলনায় তাদের সাথেই উত্তম ব্যবহার করা বেশি জরুরি।

৬.৬ নিজের অবস্থান সম্পর্কে পরিবারকে অবহিত করুন

যদি কখনও নিয়মিত কাজের বাইরে অন্য কোনো কাজে দূরে কোথাও যেতে হয়, তবে পরিবারকে গন্তব্য সম্পর্কে অবহিত করা উচিত। আপনি কোথায় আছেন– এটা জানতে পারলে তারাও মানসিকভাবে স্বস্তি অনুভব করবে।

প্রখ্যাত তাবেয়ি কাতাদা রহ. গন্তব্য সম্পর্কে পরিবারকে অবহিত না করে দূরে কোথাও যাওয়াকে অনুমোদন দেননি। ইমাম আহমাদ রহ. তাঁর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। "একবার কাতাদা রহ. আবু মাশারকে সাথে নিয়ে শাবিকে দেখতে গিয়েছিলেন। সেখানে পৌঁছালে শাবির পরিবার তাদের জানায়, তিনি বাড়িতে নেই। কাতাদা বাড়ির লোকদের প্রশ্ন করলেন, 'তিনি কোথায় গেছেন?' তারা উত্তর দিলেন, 'আমরা জানি না।' কাতাদা তখন আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, 'তার মানে তোমরা কি বলতে চাইছো, তিনি কোথায় গেছেন তা বলে যাননি? পরিবারের লোকেরা বলল, 'হ্যাঁ, তিনি কিছুই বলে যাননি।' কাতাদা রহ. শাবির এ আচরণ অপছন্দ করলেন।"

পরিবারকে গন্তব্য সম্পর্কে অবহিত করা হলে তাদের দুশ্চিন্তা লাঘব হয়। সফরকারী ব্যক্তি এবং তার পরিবার স্বস্তিতে থাকে। কোনো কারণে আপনার ফিরতে দেরি হলেও তারা অহেতুক দুশ্চিন্তা করে না।

৬.৭ ভ্রাতৃত্ববোধের শিষ্টাচার

ভ্রাতৃত্ববোধ তখনই মজবুত ও সুদৃঢ় হবে, যখন আমরা বস্তুগত কোনো প্রাপ্তির জন্য নয় কিংবা পার্থিব কোনো ফায়দা বা পদবি পাওয়ার লোভে নয়; বরং শুধু আল্লাহর জন্যই আমরা কাউকে ভালোবাসতে পারব। কাউকে যখন আমরা

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসতে পারব, তখন দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতেই সফলতার মুখ দেখতে পাব। রাসূল সা. বলেন, "কিয়ামতের দিন আল্লাহ প্রশ্ন করবেন, সেই সব বান্দারা কোথায়; যারা আমার সম্মানে একে অপরকে ভালোবেসেছিল। আজ আমি তাদেরকে আমার আরশের ছায়ায় আশ্রয় দান করব।" *মুসলিম : ২৫৬৬*

যখন আমরা আমাদের কোনো ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করব, চেষ্টা করব যাতে আর কিছু না পারি অন্তত মুখে হাসি ধরে রাখতে। মুসলিমদের প্রাথমিক আদব ও শিষ্টাচার হলো, সে যখনই তার দ্বীনি ভাইয়ের সাথে দেখা করবে, তখনই সে হাসবে। অহংকারী হবে না, বরং কথাবার্তায় ও আচরণে বিনয়ী হওয়ার চেষ্টা করবে। আবু জার গিফারি রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "ন্যায়সংগত ও কল্যাণকর কাজের কোনো বিষয়কেই যেন তোমাদের কেউ তুচ্ছ মনে না করে। সে (ভালো করার মতো) কিছু না পেলে অন্তত তার ভাইয়ের সাথে যেন হাসিমুখে মিলিত হয়।" *মুসলিম : ২৬২৬, তিরমিযি : ১৮৩৩*

মার্জিত আচরণ, ভালোবাসা, সহানুভূতি ও দয়া– এই মানবিক গুণগুলো ভ্রাতৃত্ববোধকে মজবুত করে। আল্লাহ নিজে দয়ালু ও কোমল, তাই যারা সকল ক্ষেত্রে কোমলতা প্রদর্শন ও ধারণ করতে পারে, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন। কোমলতা দিয়ে যা আদায় করা যায়, তা কখনোই কঠোরতা দিয়ে আদায় করা যায় না। ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, "আমি কি তোমাদের জানিয়ে দেবো না, কোন ব্যক্তির জন্য জাহান্নাম হারাম এবং জাহান্নামের জন্য কোন ব্যক্তি হারাম? যে ব্যক্তি মানুষের কাছাকাছি (জনপ্রিয়), সহজ-সরল, নম্রভাষী ও সদাচারী।" *আহমাদ : ৩৯২৮, তিরমিযি : ২৪৮৮*

ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের অন্যতম দাবি হলো সুপরামর্শ দেওয়া। এর মাধ্যমে পরস্পরের প্রতি দায়বদ্ধতাও প্রমাণিত হয়। তামিম দারি রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "দ্বীন হলো কল্যাণ কামনা, উত্তম উপদেশ ও সুপরামর্শ; দ্বীন হলো কল্যাণ কামনা, উত্তম উপদেশ ও সুপরামর্শ; দ্বীন হলো কল্যাণ কামনা, উত্তম উপদেশ ও সুপরামর্শ।" সাহাবিগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! কার জন্য?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ, তাঁর রাসূল, মুমিন নেতাগণ এবং সর্বসাধারণের জন্য।'

আপনি যদি আপনার ভাই ও বন্ধুর প্রতি আন্তরিক থাকতে চান, তা হলে সব সময় তার জন্য শুভ কামনা করতে হবে। তার কাছে সত্যটাই তুলে ধরতে হবে। অহেতুক সেই ব্যক্তির তোষামোদিতে লিপ্ত হওয়া যাবে না। তার সামনে

প্রকৃত অবস্থা উপস্থাপন করতে হবে। তাকে ভুল বুঝিয়ে সত্য থেকে দূরে রাখা এক ধরনের প্রতারণার শামিল। তাকে সব সময় ভালো কাজের আদেশ দিতে হবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে। তবে মনে রাখবেন, কাউকে পরামর্শ দিতে গেলে আপনার ভেতর সেই সংক্রান্ত যথাযথ জ্ঞান থাকা জরুরি।

নিজের অন্তরকে রাগ, ঘৃণা ও হিংসামুক্ত রাখার চেষ্টা করতে হবে। অন্তরকে কলুষতামুক্ত রাখার জন্য রাসূল সা. নিয়মিত দুআ করতেন। ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. দুআ করতেন এবং বলতেন, "হে আল্লাহ! আমাকে সহযোগিতা করো এবং আমার বিরুদ্ধে (কাউকে) সহযোগিতা করো না। আমাকে সাহায্য করো এবং আমার বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করো না। আমার পরিকল্পনাকে সফল করে দাও; আমার বিরুদ্ধে করা সকল পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দাও। আমাকে হিদায়াত দান করো, আমার জন্য হিদায়াতের পথ সহজসাধ্য করো। যে আমার ওপর জুলুম ও সীমালঙ্ঘন করে, তার বিরুদ্ধে আমাকে সহযোগিতা করো। হে আল্লাহ! আমাকে তোমার কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করো। আমাকে তোমার অধিক জিকরকারী, তোমাকে বেশি ভয়কারী, তোমার নিবিড় আনুগত্যকারী, তোমার কাছে অনুনয়-বিনয়কারী ও তোমার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী করো। হে আমার রব! আমার তওবা কবুল করো, আমার সকল গুনাহ ধুয়ে-মুছে দাও। আমার দুআ কবুল করো। আমার পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ বহাল করো। আমার জবানকে দৃঢ় করো। আমার অন্তরে হিদায়াত দান করো এবং আমার বুক হতে সমস্ত হিংসা দূর করে দাও।" *আবু দাউদ : ১৫১০, আহমাদ : ১৯৯৮, তিরমিযি : ৩৫৫১*

উপরোক্ত হাদিসটিতে দেখা যাচ্ছে, যারা জুলুম করেছে তাদের বিরুদ্ধেও রাসূল সা. প্রতিশোধ নিতে চাননি। বরং তিনি তাদেরকে মোকাবিলায় আল্লাহর সহযোগিতা চেয়েছেন। সেই সাথে রাসূল সা. নিজের বুক থেকে হিংসা দূর করার জন্যও দুআ করেছেন। কেননা, এটা খুব সহজ নয়।

কেউ যদি আপনার হক নষ্ট করে, আপনার সাথে প্রতারণা করে, তা হলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া সত্যিই কঠিন। তাই অধিকাংশ মানুষই একটি অন্যায়ের বিপরীতে আরেকটি অন্যায় করে বিষয়টার সুরাহা করতে চায়। ফলে তার মর্যাদাবান ভালো মানুষ হয়ে উঠা হয় না। কিন্তু কেউ যদি সত্যি নিজেকে সংযত করতে পারে, বুক থেকে হিংসাকে মুছে ফেলতে পারে, তা হলে সে চারিত্রিক উৎকর্ষতা লাভ করতে পারবে।

বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বরক্ষার অন্যতম উপায় হলো, মিথ্যা অনুমান ও ভুল ধারণা থেকে বিরত থাকা। কোনোভাবেই কারও আড়ালে তার গিবত ও পরনিন্দা না করা। আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> "হে ঈমানদারগণ! তোমরা অত্যধিক ধারণা বা অনুমান করা থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, কোনো কোনো ধারণা পাপ। তোমরা অপরের গোপন বিষয় সন্ধান করো না, তোমাদের কেউ যেন কারও আড়ালে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণাই করো। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।" *সূরা হুজুরাত : ১২*

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি সা. বলেছেন, "সাবধান! তোমরা সন্দেহ করা থেকে মুক্ত থাকো। কারণ, সন্দেহ সবচেয়ে বড়ো মিথ্যাচার। পরস্পরের বিরুদ্ধে তথ্য তালাশ করো না এবং গোয়েন্দাগিরি করো না।" *বুখারি : ৫১৪৪, মুসলিম : ২৫৬৩, আবু দাউদ : ৪৯১৭*

অনেকে হিংসা ও শত্রুতা করতে গিয়ে এতটাই বেপরোয়া হয়ে যায় যে, সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে দিতেও পরোয়া করে না। কিন্তু রাসূল সা. এই ধরনের আচরণকে স্পষ্টভাবে নিষেধ করে গেছেন। আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "তোমরা পরস্পরকে ঘৃণা করো না, হিংসা করো না, একে অপরের পেছনে গোয়েন্দাগিরি করো না; বরং আল্লাহর বান্দারা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। যেকোনো মুসলিমের জন্য তার কোনো ভাইয়ের সঙ্গে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক বিচ্ছেদ করা জায়েজ নয়।" বুখারি : ৬০৬৫, মুসলিম : ২৫৫৯, আবু দাউদ : ৪৯১০

অসংখ্য হাদিস থেকে জানা যায় যে, দুজন বা তার বেশি মুসলিমদের মধ্যে বিবাদ নিরসনে কেউ যদি এগিয়ে আসে এবং সফলভাবে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটাতে পারে, তা হলে তার জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে উত্তম পুরস্কার ও সম্মান রয়েছে। সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার একটা বড়ো কারণ অন্যের গোপন কোনো তথ্য ফাঁস করে দেওয়া। তাই আপনার কাছে কেউ যদি কোনো গোপন তথ্য শেয়ার করে, আপনি তা গোপন রাখবেন; যত্রতত্র বলে বেড়াবেন না। মনে রাখবেন, মুনাফিকের যে তিনটি নিদর্শন তার মধ্যে একটি হলো, আমানতের খেয়ানত করা। আর অন্যের গোপন কথা নিজের মধ্যে গোপন রাখাটাও বড়ো আকারের আমানত।

৬.৮ দরিদ্রদের সম্মান করা

যদি কোনো জনসমাগমস্থলে কোনো দরিদ্র ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হয় কিংবা কোনো দরিদ্র ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান, তবে তার প্রতি অবহেলাভরে তাকাবেন না। দরিদ্র হওয়ায় তাকে হেয় মনে করবেন না। দারিদ্র্য এমন কোনো রোগ বা সংকট নয়, যার জন্য সে ছোটো হয়ে থাকবে কিংবা আপনি তাকে অবহেলা করার সুযোগ পাবেন।

দরিদ্র অতিথি ও বন্ধুদের সঙ্গে শ্রদ্ধাশীল আচরণ করুন। তাদের সঙ্গে কথা বলার সময় হাসিমুখে কথা বলুন। কোমল ভাষা ও উত্তম শব্দ প্রয়োগ করুন। দরিদ্রতা কোনো পাপ নয়। অনেক দরিদ্র ব্যক্তি আছেন, যারা অন্য অনেকের তুলনায় অরেক বেশি সৎ ও তাকওয়াবান।

ইসলাম বিয়ের দাওয়াত গ্রহণ করাকে জরুরি বলে ঘোষণা করেছে। মুসলিমদের বিয়েতে যাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। এমনও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়– সাহাবি রোজাদার, তারপরও তিনি বিয়ের দাওয়াত রক্ষার্থে সেই অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছেন। হাদিসে এসেছে, "যে ইচ্ছাকৃতভাবে বিয়ের দাওয়াত অগ্রাহ্য করল, সে প্রকারান্তরে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যকে অস্বীকার করল।" *আবু দাউদ : ৩৭৪২*

অথচ আরেকটি বিপরীত বাস্তবতাও আছে। হাদিসে সেই বিয়ের খাবারকে সবচেয়ে জঘন্য খাবার বলা হয়েছে, যে বিয়েতে দরিদ্র ব্যক্তিকে দাওয়াত দেওয়া হয়নি। তাই আমাদের দাওয়াতের তালিকায় যেন শুধু বড়োলোক আত্মীয় বা পরিচিতজনরাই না থাকে; বরং অভাবী মানুষগুলোকেও যেন গুরুত্বের সঙ্গে দাওয়াত দেওয়া হয়।

রাসূল সা. বলেছেন, "সবচেয়ে খারাপ খাবার হলো সেই বিয়ের অনুষ্ঠানের খাবার, যেখানে শুধু ধনী লোকদেরই দাওয়াত করা হয়। আর দরিদ্রদের অবজ্ঞার সঙ্গে এড়িয়ে যাওয়া হয়।" *বুখারি : ৫১৭৭, মুসলিম : ১৪৩২*

আমাদের মধ্যে এমন অনেককেই দেখা যায়, যারা প্রায়শ বাড়ির কাজের লোকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। পত্র-পত্রিকায় গৃহ পরিচারিকাদের ওপর নির্মম নির্যাতনের অনেক ছবি ও সংবাদ পাওয়া যায়। অথচ ইসলাম এ ধরনের আচরণকে অনুমোদন করে না। কাজের লোকদের প্রতি সহানুভূতিশীল, দয়ার্দ্র হওয়া ইসলামের শিক্ষা। এমনকি কাজের লোকেরা কোনো ভুল করলেও রাসূল সা. তাদের ক্ষমা করে দেওয়ার কথা বলেছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, "এক ব্যক্তি রাসূল সা.-এর নিকট এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কাজের লোককে প্রতিদিন কতবার মাফ করব?' তিনি চুপ থাকলেন। লোকটি আবার একই প্রশ্ন করলে এবারও তিনি চুপ থাকলেন। তৃতীয়বার প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, 'প্রতিদিন সত্তর বার'।" *আবু দাউদ : ৫১৬৪*

৬.৯ অমুসলিমদের সাথে আচরণ

যদি আপনার প্রতিবেশীর মধ্যে কেউ অমুসলিম থাকে, তবে তার সাথে ইসলামি আদবের অনুসরণ করার চেষ্টা করুন। ইসলাম ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক রাখার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে।

একজন মুসলিম হিসেবে অন্য ধর্মাবলম্বীদের সামনে ইসলামের মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য তুলে ধরা উচিত। প্রত্যেকের সঙ্গে মার্জিত ও সহানুভূতিশীল আচরণ করতে হবে। বুখারি ও মুসলিমে খাদিমে রাসূল আনাস রা.-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সা. বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিজের জন্য যা ভালোবাসে, তার ভাইয়ের জন্যও যদি একই জিনিস পছন্দ করতে না পারে, তবে সে ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"

মুসলিমের অপর বর্ণনায় হাদিসটি এভাবে এসেছে, "নিজের জন্য পছন্দসই কোনো বিষয় বা বস্তুকে একজন মানুষ যদি তার ভাই বা প্রতিবেশীর জন্যও বাছাই করতে না পারে, তবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"

আলিমগণ ব্যাখ্যা করেছেন, এখানে যে 'ভাই' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, তা সাধারণভাবেই করা হয়েছে। ভাইয়ের এই ধারণার মধ্যে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষই অন্তর্ভুক্ত। একজন মুসলিমকে তার অমুসলিম ভাইয়ের জন্য ঠিক সেই বিষয়টাই পছন্দ করতে হবে, যা সে তার নিজের জন্য করে থাকে। আর মানসিকভাবে ততটা উদার ও বড়ো মনের হতে পারলেই একজন মুসলিম ইসলামের সত্যিকারের সৌন্দর্য ধারণ করতে এবং অমুসলিমদের সামনে ইসলামের সৌন্দর্যকে যথার্থভাবে উপস্থাপন করতে পারবে।

প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব হলো তার অমুসলিম ভাই-বোনদের হিদায়াতপ্রাপ্তির জন্য আল্লাহর দরবারে দুআ করা। একইসঙ্গে, মুসলিম ভাই-বোনদের জন্যও দুআ করা, যেন তারা দ্বীনের পথে অটল থাকতে পারে এবং আন্তরিক ও একনিষ্ঠভাবে ইসলামের অনুশাসনগুলো মেনে চলতে পারেন। কুরআন মাজিদের সূরা মুমতাহিনায় আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> "দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন। আল্লাহ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদের দেশ থেকে বহিস্কৃত করেছে এবং বহিষ্কারকার্যে সহায়তা করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারাই জালিম।"
> *সূরা মুমতাহিনা : ৮-৯*

তাই অমুসলিম ব্যক্তি যদি আল্লাহর শানে এবং ইসলাম সম্বন্ধে বাজে কথা না বলে, তবে তাদের প্রতি আমাদের অবশ্যই দয়ালু, উদার ও সহনশীল হতে হবে। হয়তো এই সদাচরণের ফলে তারা একসময় ইসলামের প্রতি দরদ অনুভব করবে। হয়তো তারা ইসলাম কবুল করতে অনুপ্রাণিত হবে।

উল্লেখ্য, অমুসলিমদের সাথে ভালো ব্যবহারের অর্থ এমন নয় যে– আমরা তাদের মতো করেই সব কাজ করব অথবা মুসলিম হিসেবে আমাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দেবো। বরং ভালো ব্যবহারের অর্থ হলো, আমরা তাদের সাথে সব সময় সত্যনিষ্ঠ, সহানুভূতিশীল ও নমনীয় আচরণ করব।

এ প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবি রহ. বলেন, "যারা মুসলিমদের হেয় করেনি বা তাদের ওপর আক্রমণ করেনি, তাদের সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ ও সহনশীল আচরণ করার জন্য আল্লাহ তায়ালা নির্দেশনা দিয়েছেন।"

ইমাম কুরতুবি এক্ষেত্রে উদাহরণ দিতে গিয়ে আবদুর রহমান ইবনে জায়েদ রহ.-এর একটি মন্তব্যকেও সামনে নিয়ে আসেন। ইবনে জায়েদ অভিমত দিয়েছিলেন, "অমুসলিমদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণের নীতিগুলো ইসলামের প্রথম যুগে প্রণীত হয়, যখন পর্যন্ত কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ফয়সালা আসেনি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে অনেক যুদ্ধ হলেও অমুসলিমদের সাথে উত্তম ব্যবহারের এই রীতিতে কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি।"

এরপর ইমাম কুরতুবি রা. প্রখ্যাত তাবেয়ি কাতাদা রহ.-এর একটি মন্তব্যও তুলে ধরেন। কাতাদা দাবি করেন, কুরআনের উপরোক্ত আয়াতটি আর প্রয়োগযোগ্য থাকবে না। কারণ, পরবর্তী সময়ে সূরা তাওবার নিম্নোক্ত আয়াতটিও আল্লাহ নাজিল করেছেন।

"অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের যেখানে পাও, সেখানেই হত্যা করো। তাদের বন্দি করো এবং অবরোধ করো। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওত পেতে বসে থাকো। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামাজ কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" *সূরা তাওবা : ৫*

আবদুর রহমান ইবনে জায়েদ এবং কাতাদার দুটি মন্তব্য উপস্থাপন করার পর উপসংহারে ইমাম কুরতুবি রহ. বলেন, অধিকাংশ আলিম ও মুফাসসিরগণ মনে করেন, সূরা তাওবার উক্ত আয়াত নাজিল হওয়ায় অমুসলিমদের সাথে সদ্ব্যবহারের আয়াতটি অকার্যকর হয়ে যায়নি। এক্ষেত্রে বুখারি ও মুসলিম শরিফে আসমা বিনতে আবু বকর রা.-এর একটি ঘটনার কথা জানা যায়।

একবার তিনি নবি সা.-কে প্রশ্ন করলেন, 'আমার বাড়িতে যদি কোনো অমুসলিম নারী বেড়াতে আসে, তবে কি তার সেবা করতে পারব, দরদি আচরণ করতে পারব?' রাসূল সা. জবাব দিয়েছিলেন, 'অবশ্যই পারবে।'

সূরা মুমতাহিনার যে আয়াতে অুমসলিমদের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ ও সহনশীল আচরণ করার কথা বলা হয়েছে, সেই আয়াতটি নাজিল হওয়ার একটি প্রেক্ষাপট আছে। আল মাওয়ার্দি এবং আবু দাউদ উদ্ধৃত করেন, আমর বিন আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রহ. বর্ণনা করেন, তাঁর বাবা তাকে বলেছেন, ইসলাম গ্রহণের আগে আবু বকর রা. তাঁর স্ত্রী কুতাইলাকে তালাক দিয়েছিলেন। এই কুতাইলার গর্ভেই আসমা রা.-এর জন্ম হয়। আসমা হিজরত করে বাবা আবু বকরের কাছে মদিনায় চলে যান।

যাহোক, হিজরতের বেশ কয়েক বছর পর, কুরাইশ পৌত্তলিকদের সঙ্গে যখন নবিজির চুক্তি হয়, তখন কুতাইলা মদিনায় তার মেয়েকে দেখতে আসেন। তিনি মেয়ের জন্য কানের দুল এবং আরও উপহারসামগ্রী নিয়ে আসেন। মা অমুসলিম হওয়ায় তার উপহার নেওয়ার ব্যাপারে আসমা বিনতে আবু বকর রা. সংশয়ে ছিলেন। তিনি রাসূল সা.-এর মতামত জানতে চাইলেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তায়ালা উপরোক্ত আয়াতটি নাজিল করেন।

আল্লাহ তায়ালা অমুসলিমদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করার জন্য মুসলিমদের আদেশ করেছেন। 'আর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেনি', বলে তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে, যারা সরাসরি

মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামেনি। বিশেষ করে বনু খোজায়া গোত্র এবং এ জাতীয় অন্যান্য গোত্রগুলো, যারা মুসলিমদের সঙ্গে এই মর্মে মৈত্রী চুক্তি করেছিল, তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। সেইসঙ্গে মুসলিমদের প্রতিপক্ষদেরও সহযোগিতা করবে না। আল্লাহ তায়ালা চুক্তিতে আবদ্ধ এই সব গোত্রগুলোর সাথেও সহানুভূতিশীল আচরণ করার জন্য মুসলিমদের নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

অন্যদিকে কাজি আবু বকর আল আরাবি রহ. বলেন, "কুরআনের আয়াতে এখানে যে ইনসাফের কথা বলা হয়েছে, তা ন্যায়বিচার সম্পর্কিত নয়; বরং অংশীদারিত্বের হিসেবে। অর্থাৎ একজন মুসলিম তার অমুসলিম ভাইয়ের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার স্বার্থে তার প্রাপ্য অর্থ তাকে অবশ্যই প্রদান করবে। আর শত্রু বা মিত্র যাই হোক না কেন, ন্যায়বিচার পাওয়া সকলেরই অধিকার।"

ইমাম বুখারি এবং আহমাদ রহ. এ প্রসঙ্গে আনাস বিন মালিক রা.-এর একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। এক ইহুদি কিশোর ছিল, যে নবিজির অজুর পানি, জুতো এগিয়ে দিত। একবার সেই কিশোরটি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল। খবর পেয়ে নবিজি সা. তাকে দেখতে গেলেন। তিনি দেখলেন, ছেলেটি একেবারে মৃত্যুসজ্জার বিছানায় শুয়ে আছে; তার পিতা শিয়রে বসে আছে।

রাসূল সা. কিশোরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং আহ্বান করলেন, 'বলো, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।' কিশোর ছেলেটি তার পিতার দিকে তাকাল, কিন্তু তার বাবা তখনও নীরব। নবিজি সা. আবারও অনুরোধ করলেন। এবারও ছেলেটি বাবার মুখপানে চেয়ে রইল। অবশেষে বাবা বললেন, 'আবুল কাসেম (নবিজি) যা বলতে বলছেন, বলো।' ছেলেটি ঠিক মৃত্যুর আগ মুহূর্তে বলল, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আর আপনি হলেন আল্লাহর রাসূল।' এটা শোনার পর নবিজি সা. গভীর ভালোবাসার সাথে বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ, আমি তাকে বাঁচাতে সক্ষম হলাম।'

ইবনে হাজার রহ. এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, "মুসলিমরা অমুসলিমদের কাজে নিয়োগ করতে পারবে, অসুস্থ হলে দেখতে যেতে পারবে। এই হাদিসটি একইসঙ্গে অমুসলিমদের প্রতি আন্তরিক হওয়ার তাগিদ দেয়। তরুণ ও যুবকদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার জন্য, তাদের ইসলামের পথে নিয়ে আসার জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালানোরও নির্দেশনা প্রদান করে।"

অন্যদিকে, প্রখ্যাত মুহাদ্দিস বদরুদ্দিন আইনি রহ. বলেন, "অমুসলিমদের অসুস্থ অবস্থায় দেখতে যাওয়া এবং অমুসলিম প্রতিবেশীর প্রতি সদয় হওয়ার

জন্য ইসলাম যে তাগিদ দিয়েছে, তার মাধ্যমে ইসলামের সহনশীলতা এবং উদারতাই প্রকাশ পায়। ইসলামের এই ঔদার্যের কারণেই অমুসলিমরা সব সময়ই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। তরুণ-যুবাদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার জন্য ইসলাম কতটা আন্তরিক, তাও এই বর্ণনা থেকে অনুধাবন করা যায়।"

কোনো অমুসলিমের প্রতি শোক জানাতে হলে অবশ্যই সঠিক বচনে শোক জানাতে হবে। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. *কিতাবুল খারাজ*-এর শেষাংশে একটি স্মৃতিচারণে বলেন, "আমার শিক্ষক ইমাম আবু হানিফার কাছে জানতে চেয়েছি, 'কোনো পরিচিত ইহুদি ও খ্রিষ্টান যদি আপনজন হারায় বা শোকে মুহ্যমান থাকে, তবে তাদের প্রতি কীভাবে শোক প্রকাশ করা যায়?' উত্তরে তিনি বলেন, 'তুমি বলবে– আল্লাহ সকল সৃষ্টির জন্যই মৃত্যু নির্ধারিত করে রেখেছেন। আমরা শুধু আল্লাহর কাছে দুআ করতে পারি, যাতে সবার ভাগ্যেই উত্তম মৃত্যু জোটে। আমরা সবাই আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি আবার তাঁর কাছেই ফিরে যাব। তাই ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে শোকাবহ পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে হবে'।"

ইমাম আবু ইউসুফ আরও বলেন, হাসান বসরি রহ.-এর কাছে একজন খ্রিষ্টান পড়তে আসত। সেই খ্রিষ্টান ছাত্রের ভাইকেও ইমাম বসরি রহ. সান্ত্বনা দিতে গিয়েছিলেন। কারও মৃত্যুর পর সেই পরিবারকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে ইমাম বসরি রহ. এভাবে দুআ করতেন, "আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রকৃত অনুসারীদের জন্য যে পুরস্কার নির্ধারণ করে রেখেছেন, তা যেন এই মরহুমকেও দান করেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের মৃত্যুকে নিয়ামতে পূর্ণ করে দেন। আমরা যে পরম সৌভাগ্য কামনা করি, আমাদের জন্য তা নসিব করে দিন। এই কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধৈর্য দান করুন।"

মৃত্যু এমন একটি নিয়তি যা আমরা কেউ-ই অস্বীকার করতে পারব না। তাই মৃত মানুষদের জন্য স্বস্তিদায়ক দুআ করা উচিত এবং সব সময় নিজেদের মৃত্যুর কথা স্মরণ করে তার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া উচিত।

ইবনে আবেদিন রহ. তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *রদ্দুল মুখতার*-এ ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর একটি মন্তব্য উল্লেখ করেছেন। ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন, "একজন অমুসলিম পরিজনের মৃত্যুতে দেখতে গেলে আপনি সেখানে তার মুসলিম পরিজনদের প্রতি সহানুভূতি জানাতে পারেন। এরকম অবস্থায় আপনি এভাবেও অমুসলিমদের জন্যও দুআ করতে পারেন, 'আল্লাহ তায়ালা আপনাকে উত্তম ধৈর্য দান করুন।' আবার কোনো অমুসলিম ব্যক্তি যখন তার কোনো মুসলিম পরিজনকে হারায়, তখন আপনি এভাবে দুআ করতে পারেন যে, 'আল্লাহ মরহুমের যাবতীয় গুনাহকে মাফ করে দিন এবং তাকে জান্নাত দান করুন'।"

খাওয়ার আদব

৭.১ খাওয়ার আদবের গুরুত্ব

খাদ্যদ্রব্য মানুষের জন্য আল্লাহর সবচেয়ে বড়ো নিয়ামতের একটি। মানুষ খেয়েই বেঁচে থাকে। আর প্রতিনিয়ত আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এই রিজিক সরবরাহ করে থাকেন। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন,

> "হে রাসূলগণ! পবিত্র বস্তু থেকে আহার করুন এবং সৎকাজ করুন। যা করেন সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অবগত।" *সূরা মুমিনুন : ৫১*

আল কুরআনে আল্লাহ আরও বলেন,

> "আল্লাহর দেওয়া রিজিক খাও এবং পান করো। আর দুনিয়ার বুকে ফাসাদ সৃষ্টি করো না।" সূরা বাকারা : ৬০

তবে, ইসলামি শিষ্টাচার অনুযায়ী খাওয়ার কিছু আদব রয়েছে। খাওয়ার আদব সম্পর্কে জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, দিনে কয়েকবার খাবার খেতে হয়। যখন আমরা একা খাই, পরিবারের সাথে খাই কিংবা বন্ধুবান্ধবের সাথে খাই– প্রতি ক্ষেত্রেই আমাদের এই আদবগুলো অনুসরণ করা উচিত। খাওয়ার ক্ষেত্রে অযথা ভান করা বা লোক দেখানো স্টাইল উপস্থাপন করা ঠিক নয়। নিজেকে সঠিকভাবে খাবার খাওয়ার জন্য প্রস্তুত করুন। খাবার একা খান বা অন্য কারও সঙ্গে, শিষ্টাচার মেনে চলার জন্য নিজেকে প্রশিক্ষিত করুন। তা হলেই এই আদবগুলো আপনার আচরণের সহজাত বৈশিষ্ট্যে পরিণত হবে এবং আপনার খাওয়া তৃপ্তিদায়ক হবে।

৭.২ খাওয়ার আদবসমূহ

খাওয়ার সময় কিছু আদব আছে যা মেনে চলা খুবই জরুরি। যেমন শুরু করার আগে 'বিসমিল্লাহ' বলা। রিজিকদাতা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান এবং খাবার শেষ করার পর বলুন 'আলহামদুলিল্লাহ'। ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, "খাওয়ার আগে বিসমিল্লাহ পড়া শরীর ও মন উভয়ের জন্যই

কল্যাণকর।" আর ইমাম আহমাদ রহ. বলেন, "চারটি জিনিস একসঙ্গে ঘটলেই খাবারের আয়োজনটি পরিপূর্ণ হয়। ১. খাবার আগে আল্লাহর নাম নেওয়া ২. খাওয়া শেষে আল্লাহর নাম নেওয়া এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ৩. কয়েকজন মিলে খাবারটি শেয়ার করে খাওয়া বা একসঙ্গে কয়েকজন মিলে খাওয়া এবং ৪. হালাল উপার্জনের মাধ্যমে খাবার ক্রয় করা।"

হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রা. বর্ণনা করেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ সা.-এর সঙ্গে খেতে বসলে তাঁর খাওয়া আরম্ভ করার পূর্বে আমরা কেউ খাদ্যের দিকে হাত বাড়াতাম না। একদিন আমরা তাঁর সাথে খেতে বসি। এমন সময় এক বেদুইন এমনভাবে দৌড়ে এলো, যেন কেউ তাকে পেছন হতে তাড়া করছে। সে খাবারের পাত্রে হাত দিতে যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সা. তার হাত ধরে ফেললেন। অতঃপর একটি বালিকা দৌড়ে এলো, তাকেও যেন কেউ পেছন হতে তাড়া করছে। সেও খাদ্যের মধ্যে হাত ঢুকাতে যাচ্ছিল। রাসূল সা. তার হাতও ধরে ফেললেন। তিনি বললেন, "যে খাদ্য আল্লাহর নাম নিয়ে খাওয়া হয় না, তাতে শয়তান শরিক হয়। শয়তান প্রথমে বেদুইনকে নিয়ে এসেছিল তার সঙ্গে খাদ্যে অনুপ্রবেশ করতে। আমি তার হাত ধরে ফেলি। ওই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! শয়তানের হাত এখন এই দুজনের হাতের সাথে আমার হাতের মধ্যে বন্দি।" *আবু দাউদ : ৩৭৬৬*

কেউ যদি কোনো কারণে খাওয়ার আগে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে যায় তারও সমাধান আছে। উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন, "যখন তোমরা খাওয়া শুরু করো, তখন আল্লাহর নাম স্মরণ করো। আর যদি আল্লাহর নাম স্মরণ করতে ভুলে যাও, তা হলে বলো, 'বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু'– আল্লাহর নাম শুরুতেও শেষেও।" *আবু দাউদ : ৩৭৬৭, তিরমিযি : ১৮৫৮*

আপনার সামনে যে খাবার দেওয়া থাকবে, তা থেকেই খাবেন। সব সময় ডান হাত দিয়ে খাবেন। একবার এক মুনাফিক বাম হাত দিয়ে খাচ্ছিল। রাসূল সা. দৃশ্যটি দেখার পর বিরক্ত হন এবং তাকে ডান হাত দিয়ে খেতে বলেন। মুনাফিক রাসূল সা.-এর কথা শুনেনি; বরং সে একটি মিথ্যা অজুহাত তুলে বলে, 'আমি তো ডান হাত ব্যবহার করতে পারি না।' তখন রাসূল সা. উত্তরে বলেন, 'তাই যেন হয়।' এই ঘটনার পর থেকে সেই মুনাফিক আর কখনোই তার ডান হাত উঁচু করতে পারেনি। *মুসলিম : ২০২১*

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, নবি সা. বলেছেন, "বাম হাতে যেন তোমাদের কেউ না খায় এবং পান না করে। কেননা, শয়তান বাম হাতে পানাহার করে।"

রাসূল সা.-এর নির্দেশনা থাকায় সাহাবিরাও সব সময় ডান হাত দিয়ে খাবার খেতেন। সাইয়িদুনা উমর রা. খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার পর একবার একটি অনুষ্ঠানে খাওয়ার সময় এক ব্যক্তিকে বাম হাত দিয়ে খেতে দেখেন। তিনি লোকটিকে ডান হাত ব্যবহার করার পরামর্শ দেন। লোকটি জানায়, আমার ডান হাতটি দিয়ে আমি অন্য কাজ করছি, তাই এই মুহূর্তে সেই হাত দিয়ে খেতে পারছি না। উমর রা. আবারও তাকে ডান হাত দিয়ে খাওয়ার অনুরোধ করলেন এবং লোকটি এবারও একই উত্তর দিলো। এবার উমর রা. একটু কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলেন, 'আমি কি জানতে পারি, আপনার ডান হাতটি কী কাজে এখন ব্যস্ত আছে?' তখন লোকটি জানায় যে, 'আমার ডান হাত যুদ্ধ করতে গিয়ে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় আমি তা ব্যবহার করতে পারছি না।' বিষয়টি জানার পর উমর রা. লজ্জিত হন। তিনি কেন যুদ্ধাহত একজন ব্যক্তিকে এভাবে বললেন, তা ভেবে মর্মাহত হন। সাথে সাথেই তিনি রাজকোষের জিম্মাদারকে দায়িত্ব দেন, যাতে লোকটিকে রাষ্ট্রীয়ভাবে একজন সেবক সরবরাহ করা হয় যে খাবার খাওয়া এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত কাজে লোকটিকে সাহায্য করতে পারে।

যদি হাত দিয়ে খাবার খান, তা হলে তিন আঙুল ব্যবহার করবেন। ছোটো ছোটো লোকমায় খাবেন। তিন আঙুল দিয়ে খাবার নিয়ে খুবই নমনীয়ভাবে খাবেন এবং আগ্রাসীভাব পরিহার করবেন। অনাকাঙ্ক্ষিত শব্দ যেন না হয় সে জন্য খাবার মুখে দিয়েই মুখ বন্ধ করে ফেলুন। রাসূল সা. সব সময় মাটিতে বসে খেতেন। তাই সুন্নাত হিসেবে এই আচরণটি অনুসরণ করা যায়। তবে টেবিলে বসে খেতেও কোনো সমস্যা নেই। ইমাম গাজালি রহ. বলেন, "টেবিলে বসে খাবার খেলে অনেকের জন্য খাবার গ্রহণ করতে সুবিধা হয় আর তাতে আপত্তি করার কোনো কারণ নেই।" টেবিলে বয়স্ক কোনো ব্যক্তি থাকলে তিনি খাবার খেতে শুরু না করার আগে আপনি খাবেন না। আর আপনি যদি সবার মধ্যে মুরব্বি হন, তা হলে টেবিলে অন্য সবার জন্য অপেক্ষা করুন। সবাই এসে চেয়ারে বসলেই আপনি খাওয়া শুরু করুন।

একেকবার প্লেটের একেক জায়গা থেকে খাওয়া ঠিক নয়। তা দেখতে যেমন অসুন্দর, ঠিক একইভাবে হাদিসও এভাবে খেতে বারণ করা হয়েছে।

যদি খেতে খেতে নামাজের ওয়াক্ত হয়ে যায়, তা হলে তাড়াহুড়ো করে খাবার খাওয়া বা খাবার রেখে উঠে যাওয়া ঠিক নয়। বরং খাওয়াটা যতদূর সম্ভব জলদি শেষ করে তারপর নামাজে যেতে হবে।

খাওয়ার সময় কম কথা বলা শ্রেয়। যদি বলতেই হয় তা হলে সুন্দর করে কথা বলুন। এমন বিষয়াবলি নিয়ে কথা বলুন যা খাওয়ার সাথে সম্পৃক্ত। অযথা ও অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে খাবারের পরিবেশ বা রুচি নষ্ট করা ঠিক নয়। খাওয়ার সময় রবের প্রশংসা করা উত্তম। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. একবার কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, "নীরবতার সাথে খেয়ে যাওয়ার তুলনায় খাবার গ্রহণের পাশাপাশি আল্লাহর প্রশংসা করা উত্তম।" খাওয়া শেষে হাত ধোয়ার সময় মুরব্বিদের অগ্রাধিকার দিন।

খাবার খেতে গিয়ে যদি কিছু অংশ প্লেটের বাইরে পড়ে যায়, তা হলে তা উঠিয়ে খাওয়া বাঞ্ছনীয়। রাসূল সা. বলেছেন, "শয়তান তোমাদের সাথেই থাকে এবং তোমাদের প্রতিটি কাজের সময়ও সে উপস্থিত থাকে। যখন তোমরা খাও, তখনও সেখানে শয়তান উপস্থিত থাকে। তাই তোমাদের খাবার খাওয়ার সময় যদি কোনো অংশ বাইরে পড়ে যায়, তা হলে যদি তাতে কোনো ময়লা থাকে, তা শয়তানের জন্য রেখে দাও আর বাকি অংশটুকু নিজেরাই খেয়ে নাও। ময়লার সাথে খাবারের ওই অংশটাও শয়তানের জন্য রেখে দিয়ো না। খাবার খাওয়া শেষ হলে তোমরা প্লেট এবং আঙুলগুলো চেটে খেয়ো। কেননা, তোমরা জানো না যে, খাবারের কোন অংশে বরকত রয়েছে।" *মুসলিম : ২০৩৩*

আবু দাউদ ও *নাসায়ি*-র 'দিন ও রাতের আমল' শীর্ষক অধ্যায়ের একটি হাদিসে বলা হয়েছে, "তোমরা খাবার শেষ করার পর আল্লাহ তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।" আবু আইয়ুব আনসারি রা. থেকে বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ সা. খাওয়া বা পান করার পর বলতেন– সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি খাওয়ালেন, পান করালেন, উদরে প্রবেশ করা সহজ করে দিলেন এবং এগুলো বের হওয়ারও ব্যবস্থা রাখলেন।" *আবু দাউদ : ৩৮৫১*

খাওয়া শেষে রাসূল সা. আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানাতেন ও দুআ করতেন। আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. খাবার শেষ করে বলতেন, الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا। তিনি কখনও এই দুআ পড়তেন الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ। অর্থাৎ "সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি খাবার খাইয়েছেন, পানি পান করিয়েছেন এবং আমাদেরকে মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।" *বুখারি : ৫৪৫৮*

সেই আল্লাহ তায়ালার প্রতি অবশ্যই কৃতজ্ঞ হতে হবে, যিনি আমাদের খাদ্য ও পানীয় দান করেন। কোনো অনুষ্ঠানে বা আয়োজনে গেলে যারা এই আয়োজনটি করেছেন, তাদের জন্যও খাবার শেষে দুআ করা উচিত। মুসলিম শরিফে মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ রা. থেকে বর্ণিত, "রাসূল সা. খাওয়ানোর আয়োজকের জন্য দুআ বলতেন, 'যারা আমাদের খাওয়ালো তাদের জন্য আল্লাহ উত্তম রিজিকের ব্যবস্থা করে দিন। যারা পানীয় সরবরাহ করলেন, তাদেরও আল্লাহ পানীয় দিয়ে তৃষ্ণা নিবারণের ব্যবস্থা করে দিন'।"

কোনো আয়োজনে গেলে খাবার দেখে নিজের পছন্দ বা অপছন্দের খাবারের বিষয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলবেন না। হয় খাবারটি খেয়ে নিন অথবা নীরবে আপনার পাশের মানুষটির দিকে এগিয়ে দিন। আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, "রাসূল সা. কখনোই কোনো খাবার নিয়ে তাঁর অপছন্দের ব্যাপারটি প্রকাশ করতেন না। তিনি পছন্দ করলে নীরবে খেতেন। আর যদি অপছন্দ করতেন, তা হলে নীরবেই তিনি খাবারটি পাশে সরিয়ে রাখতেন।" *আবু দাউদ : ৩৭৬৩*

কখনোই প্লেটে আপনার সাধ্যের চেয়ে বেশি খাবার তুলে নেবেন না। খাবার বেঁচে গেলে তা বাইরে ছুড়ে ফেলবেন না, অপচয় করবেন না। বেশি করে একবারে খাবার না নিয়ে বরং অল্প পরিমাণে বার বার নিন। রাসূল সা. প্লেটে খাবার ফেলে রাখতে নিষেধ করে বলেছেন, "তোমরা প্লেটে খাবার রেখে উঠে যেয়ো না। কেননা, তোমরা জানো না যে খাবারের কোন অংশে আল্লাহর বরকত ছিল।" *ইবনে মাজাহ : ১৯১৪*

খাবার হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত। তাই খাবারের অপব্যবহার বা অপচয়কে ইসলাম অনুমোদন দেয় না। কখনও দরিদ্র ব্যক্তিদের কথা ভুলে যাবেন না। আপনি যে খাবারটি নষ্ট করছেন বা অপচয় করছেন, সে হয়তো ততটুকু খাবারও খেতে পায় না।

খাবারের পরিমাণের ব্যাপারে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। খাবার যদি অতিরিক্ত পরিমাণে খান, তা হলে শরীরে অলসতা ভর করবে। বেশি পরিমাণে খেলে শরীরটা ভারী অনুভব হবে। ফলে স্বাভাবিক কোনো কাজ বা আল্লাহর ইবাদত সঠিকভাবে করতে পারবে না। আবার কেউ যদি খুবই কম পরিমাণে খাবার খায়, তা হলেও সে হয়তো এতটাই দুর্বল হয়ে যাবে যে, ঠিকমতো নিজের বা আল্লাহর হক আদায় করতে পারবে না।

ইবনে আবদুল বার রহ.-এর বর্ণনা করেছেন, একদিন উমর রা. একটি খুতবায় বলছিলেন, "অতিরিক্ত খাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক হও। কেননা, অতিভোজন

মানুষকে ইবাদত করার ক্ষেত্রে অলস বানিয়ে দেয়। শরীরের জন্যও অতিভোজন ভালো নয়। খাওয়ার বেলায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো। তা হলে তোমরা শুকরিয়া আদায় করতে শিখবে, শরীর ভালো থাকবে এবং ভালোভাবে ইবাদত করতে পারবে। একজন মানুষ তখনই ধ্বংস হয়, যখন সে তার দ্বীনের চেয়ে নিজের স্বাদ, লালসা আর খায়েসকে বেশি গুরুত্ব দেয়।"

ফুদাইল ইবনে ইয়াজ রহ. বলেন, "দুটো কাজ মানুষের অন্তরকে কঠিন ও ভারাক্রান্ত করে দেয়। অতিরিক্ত কথা বলা আর অতিভোজন।"

৭.৩ পান করার আদব

পান করার আদবও গুরুত্বপূর্ণ। পানি বা অন্য কোনো পানীয় পান করার সময়ও আল্লাহর নাম নিয়েই শুরু করতে হবে। সব সময় ডান হাতে পান করতে হবে। হারিসাহ ইবনু ওয়াহাব আল-খুযায়ি রহ. বলেন, উম্মুল মুমিনিন হাফসা বিনতে উমর রা. আমাকে বলেছেন, "নবি সা. খাবার গ্রহণ, পানীয় পান ও পোশাক পরিধানের কাজ ডান হাতে করতেন।" *আবু দাউদ : ৩২*

একবারে পুরো গ্লাসের পানি মুখের ভেতর ঢেলে দেবেন না। বরং তিনবারে থেমে থেমে এক গ্লাস পানি খাবেন। ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সা. বলেছেন, "তোমরা উটের মতো পান করো না। দুবারে বা তিনবারে নির্ধারিত পানি পান করো। পান করার আগে আল্লাহর নাম নাও। আবার পান শেষে আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জানাও।" *তিরমিযি : ১৮৮৫*

গ্লাসে নিশ্বাস ছেড়ে বা ফুঁ দিয়ে গ্লাসটি ঘোলা করবেন না। এই আচরণ অন্যদের বিরক্ত ও বিব্রত করে। ইবনে আব্বাস রা. আরেকটি বর্ণনায় বলেন, "রাসূল সা. গ্লাসের ভেতর ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন।" *আবু দাউদ : ৩৭২৮*

জগ বা কন্টেইনার থেকে সরাসরি পান করবেন না। আপনার পর আরও যদি কেউ পান করার মতো থাকে, তা হলে এই ধরনের আচরণে তারা পান করতে নিরুৎসাহিত হতে পারে। আবু হুরায়রা রা. জানিয়েছেন, রাসূল সা. সরাসরি মূল পাত্রের ছিপিতে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।

৭.৪ মাত্রাতিরিক্ত ভোজন পরিহার করুন

মার্জিত আচরণই হলো মানুষের প্রধান সম্পদ। এটা মানুষের মুকুটের মতো। তাই যদি কেউ আপনাকে কোনো দাওয়াতে বা আয়োজনে যেতে বলে এবং আপনার সামনে খাবার ও পানীয় পরিবেশন করে, তা হলে তখনও এই মুকুট

পরিধান করে থাকাই শ্রেয়। অর্থাৎ ওই ধরনের পরিস্থিতিতেও মার্জিত আচরণ করাটা জরুরি। তাই এত বেশি পরিমাণে অতিভোজনে লিপ্ত হবেন না, যা দেখে মনে হবে যে আপনি বোধ হয় অনেকটা সময় ধরে না খেয়ে আছেন। অথবা আপনার খাওয়ার ধরন দেখে যেন এমনও মনে না হয় যে, আপনি জীবনে কখনও এত সুস্বাদু খাবার চোখে দেখেননি। অনেক আইটেম পরিবেশিত থাকলেই সব খাবারই যে আপনাকে খেতে হবে– এমন নয়। যারা বেশি খায়, তাদের নিয়ে আয়োজকরাও বিব্রত থাকেন। তাই যেকোনো আয়োজনে গেলে খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে মার্জিত আচরণ ও শালীনতা বজায় রাখুন।

৭.৫ সোনা ও রুপার প্লেট বা চামচ প্রসঙ্গে

কখনও সোনা বা রুপার তৈরি প্লেট বা চামচ ব্যবহার করে খাবেন না। এগুলো ইসলামি আদবের বিরোধী। ইসলাম এই ধরনের দাম্ভিকতাকে অনুমোদন দেয় না। সহিহ বুখারিতে হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রা. বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, "তোমরা স্বর্ণ ও রুপার পাত্রে বা প্লেটে খাবার খেয়ো না। কেননা, এই পার্থিব জীবনে এগুলো কাফিরদের জন্য আর আখিরাতে এগুলো তোমাদের জন্য। যদি মেহমান হিসেবে কোথাও যাও আর তোমাদের সামনে এই জাতীয় দামি তৈজসপত্র দেওয়া হয় তা হলে মেজবানকে বলো যাতে তোমাদের সাধারণ মানের প্লেট ও পেয়ালা সরবরাহ করা হয়।"

কেন স্বর্ণ বা রুপার বাসনে খেতে না করা হলো তার কারণ নিয়ে ইসলামি চিন্তাবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। কেউ কেউ বলেন, এজন্য এইসব পাত্রে খেতে না করা হয়েছে, কারণ আগে যে স্বৈরশাসকেরা রাজত্ব করে গেছেন, এটা তাদের রীতি। তাই তাদের অনুকরণ হয় এমন কিছু করা যাবে না। আরেকটি মত হলো– মানুষের মধ্যে অপব্যয়, ঔদ্ধত্য ও অহংকারকে নিরুৎসাহিত করার জন্যই রাসূল সা. সোনা ও রুপার পাত্রে খাবার খেতে নিষেধ করেছেন।

মসজিদের আদব

৮.১ মসজিদ মুমিনজীবনের কেন্দ্রস্থল

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বান্দাদের উদ্দেশে বলেন,

> "হে বনি আদম! তোমরা প্রত্যেক নামাজের সময় সুন্দর পোশাক পরিধান করে নাও। খাও এবং পান করো এবং অপব্যয় করো না। তিনি অপব্যয়ীদের পছন্দ করেন না।" *সূরা আরাফ : ৩১*

মসজিদে যাওয়া মুমিনের প্রতিদিনের কাজ। মুমিন জীবনের একটি কেন্দ্র ও মৌলিক প্রভাবক স্থান মসজিদ। মসজিদে গমন মুমিনের জন্য কতটা প্রয়োজনীয় তা বোঝা যায় নিম্নোক্ত হাদিস থেকে।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলল্লাহ সা. বলেছেন, "জামায়াতে নামাজ পড়ার নেকি বাজারে (কর্মস্থলে) ও বাড়িতে নামাজ পড়ার চেয়ে ২৫ বা ২৭ গুণ বেশি। আর তা এ জন্য যে, যখন কোনো ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু করে নামাজের উদ্দেশ্যে মসজিদে আসে এবং নামাজই তাকে মসজিদে নিয়ে যায়, তখন তার মসজিদে প্রবেশ করা পর্যন্ত প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে একটি মর্যাদা উন্নত হয় এবং একটি করে গুনাহ মাফ করা হয়। অতঃপর যখন সে মসজিদে প্রবেশ করে, তখন যে পর্যন্ত নামাজ তাকে (মসজিদে) আটকে রাখে, সে পর্যন্ত সে নামাজের মধ্যেই থাকে। আর ফেরেশতারা ওই ব্যক্তির জন্য ততক্ষণ রহমতের দুআ করতে থাকে, যতক্ষণ নামাজের স্থানে সে বসে থাকে। তাঁরা বলে, 'হে আল্লাহ, এর প্রতি দয়া করো। হে আল্লাহ, একে ক্ষমা করো। হে আল্লাহ, এই বান্দার তওবা কবুল করো।' (ফেরেশতাদের এই দুআ চলতেই থাকে) যে পর্যন্ত সে কাউকে কষ্ট না দেয়, যে পর্যন্ত তার অজু নষ্ট না হয়।" *বুখারি : ২১১৯, মুসলিম : ১৫৩৮*

রাসূল সা. বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নামাজের উদ্দেশ্যে সঠিকভাবে অজু করবে, তারপর নামাজ পড়ার জন্য বেরিয়ে যাবে এবং জামায়াতে নামাজ আদায় করবে, আল্লাহ তার গুনাহগুলোকে মাফ করে দেবেন।" *মুসলিম*

৮.২ মসজিদে যাওয়ার আগে মুখ দুর্গন্ধমুক্ত করুন

মসজিদে যাওয়ার সময় খেয়াল করতে হবে, মুখে কোনো দুর্গন্ধ আছে কিনা। বাজে গন্ধ বের হয় এমন কিছু খেয়ে মসজিদে না যাওয়াই উত্তম। কেননা, নামাজের সময় কোনো এক মুসল্লির মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হতে থাকলে তাতে অন্যদের ইবাদতে অস্বস্তিবোধ হবে। তাই নামাজে যাওয়ার আগে এ জাতীয় কোনো জিনিস না খেলেই ভালো। অথবা খেলেও এমনভাবে পরিষ্কার করা অথবা কোনো মাউথ ফ্রেশনার ব্যবহার করা দরকার যাতে সেই দুর্গন্ধ দূর হয়ে যায়।

৮.৩ আগে যাওয়ার চেষ্টা করা

মসজিদে যাওয়ার ক্ষেত্রে সব সময় আগে যাওয়ার চেষ্টা করা কাম্য। মসজিদে যাওয়ার সময় খুব হুড়োহুড়ি ও অস্বাভাবিক গতিতে চলা উচিত নয়। বরং মসজিদে যাওয়ার পথে হাঁটার সময় এক ধরনের শান্তভাব থাকতে হবে। তা হলে মানসিকভাবেও ভালো থাকা যায় এবং নামাজে যথাযথ মনোযোগ দেওয়া যায়। দৌড়াতে দৌড়াতে নামাজে ঢুকলে নামাজে মনোযোগ দেওয়া কঠিন হয়। এমনকি নামাজ শুরু হয়ে গেলেও দৌড় দেওয়া উচিত নয়।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, আমি রাসূল সা.-কে বলতে শুনেছি, "সালাতের ইকামত দেওয়া হলে, তোমরা সালাতের জন্য দৌড়ে আসবে না; বরং স্বাভাবিক গতিতে শান্তভাবে হেঁটে আসবে এবং (ইমামের সাথে) যতটুকু সালাত পাবে আদায় করে নেবে। আর যেটুকু ছুটে গেছে তা পূর্ণ করে নেবে।" *বুখারি : ৯০৮, তিরমিযি : ৩২৮, আবু দাউদ : ৫৭২*

৮.৪ মসজিদে প্রবেশ, অবস্থান ও বের হওয়ার আদব

মসজিদে প্রবেশ করার সময় এবং মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় দুআ করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে, তখন সে যেন বলে, اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ (হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনার রহমতের দরজা খুলে দিন)। আর যখন বের হয় তখন যেন বলে, اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ (হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি।" *মুসলিম : ৭১৩, নাসায়ি : ৭২৯, আবু দাউদ : ৪৬৫*

মসজিদে প্রবেশ করেই দুই রাকাত নামাজ আদায়ের বিধান আছে। আমাদের মধ্যে মসজিদে একেবারে শেষ মুহূর্তে হাজির হওয়ার মানসিকতা রয়েছে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ তো বটেই, জুমার নামাজেও একেবারে জামাত দাঁড়ানোর সময়ে

গিয়ে আমরা হাজির হই। আবার নামাজ পড়েই আমরা বের হয়ে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে যাই। এমনকি অনেককে ডিঙিয়ে বেরিয়ে যেতেও আমরা পরোয়া করি না। কিন্তু রাসূল সা.-এর হাদিস আমাদেরকে এই জাতীয় আচরণ থেকে বিরত থাকার তাগিদ দিচ্ছে।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশে করার পর সেখানে যতক্ষণ নামাজের জন্য অবস্থান করবে, সেই সময়টাকে সালাতের মধ্যে গণ্য করা হবে। ততক্ষণ ফেরেশতারা তার জন্য নিম্নরূপ দুআ করতে থাকে, 'হে আল্লাহ, তাকে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ, এই বান্দার প্রতি দয়া করুন।' যতক্ষণ পর্যন্ত সে কাউকে কষ্ট না দেয় অথবা তার অজু না ভাঙে, ততক্ষণ পর্যন্তই ফেরেশতাগণ তার জন্য এই দুআ করতেই থাকে।" *বুখারি : ১৭৬, মুসলিম : ৬৪৯*

অনেকেরই মসজিদে শোয়ার একটি অভ্যাস থাকে। যদিও কিছু হাদিসে তথ্য পাওয়া যায় যে, রাসূল সা.-কে বেশ কিছু সাহাবি মাসজিদে তাঁর এক পায়ের ওপর অপর পা রেখে চিত হয়ে শুয়ে থাকতে দেখেছেন। তাই বলে বিষয়টাকে নিয়মিত চর্চা বানিয়ে নেওয়াও ঠিক নয়। আর যদি কেউ মসজিদে শুয়ে থাকেন, তা হলে সতর্ক থাকবেন যাতে তার গোপনাঙ্গগুলো উন্মোচিত না হয়।

অনেকেই মনে করে, মসজিদে দুনিয়াবি বিষয় নিয়ে কথা বলা হারাম। এটা সঠিক নয়। মসজিদে অবশ্যই দুনিয়াবি কথা বলা যাবে। তবে এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে, যাতে আমার কথার কারণে অন্য কারও মনোসংযোগে ব্যাঘাত না ঘটে। যারা নামাজ পড়ছেন, কুরআন তিলাওয়াত করছেন অথবা পড়াশোনা করছেন, আমাদের কথায় যেন তাদের কোনো সমস্যা না হয়। তাদের কান যেন আমাদের কথা শুনতে না পায়। দুনিয়াবি কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয়েছে বলে এটাকে নিয়মিত অভ্যাস বানিয়ে ফেলা ঠিক নয়। সব রকমের আজেবাজে বিষয় নিয়ে মসজিদে কথা বলাও কোনো শিষ্টাচারের মধ্যে পড়ে না। মসজিদে প্রবেশ করার পর কোনোভাবেই সেই ধরনের কথা বলা যাবে না বা সেই ধরনের কাজ করা যাবে না– যেগুলোকে শরিয়াত অনুমোদন দেয়নি।

মসজিদে যদি মহিলাদের যাওয়ার পরিবেশ, ব্যবস্থা ও সুযোগ থাকে; আর বাড়ির মহিলারা মসজিদে সালাত আদায় করতে চায়, তা হলে তাদেরকে সহযোগিতা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "তোমাদের কারও স্ত্রী যদি মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চায়, তবে সে যেন তাকে নিষেধ না করে।" *মুসলিম : ১০১৭*

আবু হুরায়রা রা. থেকে আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "তোমরা নারীদের আল্লাহর ঘরে (মসজিদে) যেতে নিষেধ করো না। তবে তারা বের হওয়ার সময় যেন সুগন্ধি ব্যবহার না করে।" *আবু দাউদ : ৫৬৫*

সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন দেশের শুরা কাউন্সিলও যথাযথ পরিবেশ রক্ষা সাপেক্ষে মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার বিষয়টি অনুমোদন করেছে। তবে মহিলাদেরকে আলাদা স্থানে বা পেছনের কাতারে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করতে হবে। পুরুষদের পাশে মহিলাদের নামাজে দাঁড়ানোর কোনো সুযোগ নেই।

বিয়ের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের আদব

৯.১ বিয়ে রাসূল সা.-এর সুন্নাহর একটি অংশ

যদি আপনাকে কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেওয়া হয়, তা হলে সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। বিয়ের দাওয়াত তখনই অগ্রাহ্য করতে পারবেন, যদি আপনার জানামতে সেখানে সুন্নাহ পরিপন্থি কোনো আচারাদি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বিয়েতে অংশগ্রহণ করা রাসূল সা.-এর সুন্নাহর অংশ। ইসলাম বিয়েশদিকে এক ধরনের ইবাদত এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসলাম বিয়েশাদির চুক্তি বা আক্‌দ পর্বকে মসজিদে করতে উৎসাহ দেয়। আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "তোমরা বিয়ের ঘোষণা দেবে, বিয়ের কাজ মসজিদে সম্পন্ন করবে।" *ইবনে মাজাহ : ১৮৯৫*

আলিমগণ উল্লিখিত হাদিসের আলোকে এই মর্মে মত প্রদান করেছেন যে, "বিবাহকে ব্যাপকভিত্তিক প্রচার করুন। মসজিদে বিয়ের আয়োজন করুন এবং ঘটা করে সবাইকে বিয়ের খবর জানান।" বিয়ের খবর জোরেশোরে প্রচার করার ব্যাপারে *মুসনাদে আহমাদ* সহ অন্যান্য হাদিসগ্রন্থেও হাদিস পাওয়া যায়।

অনেকে বিয়েকে ধর্মীয় ইবাদত হিসেবে গণ্য করে তাতে সংশ্লিষ্ট কন্যার অনুমতির বিষয়টিকে অবজ্ঞা করে। এমন বহু বিয়েও আমাদের সমাজে হয়, যেখানে কন্যার কাছ থেকে ন্যূনতম সম্মতিটুকুও নেওয়া হয় না। ইসলামে এরূপ করার কোনো সুযোগ নেই। যার বিয়ে তার অনুমতি অপরিহার্য। অভিভাবক জোর খাটিয়ে বা ইমোশোনালি ব্ল্যাকমেইল করে মেয়েকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দিতে পারবেন না। আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সা. বলেছেন, "কোনো বিধবা নারীকে তার সুস্পষ্ট সম্মতি ব্যতীত বিয়ে দেওয়া যাবে না এবং কুমারী মেয়েকে তাঁর অনুমতি ছাড়া বিয়ে দিতে পারবে না।' লোকেরা জিজ্ঞেস করল, 'হে আল্লাহর রাসূল! কেমন করে তার (কুমারীর) অনুমতি নেওয়া হবে?' তিনি বললেন, 'তার চুপ থাকাটাই তার অনুমতি'।" *মুসলিম*

বিয়েতে অংশগ্রহণের বিষয়টি একজন মুসলিমের সাথে অপর মুসলিমের ভ্রাতৃত্ববোধের অপরিহার্য দাবি। বিয়েতে ঘটা করে আয়োজন করলে হাদিসের নির্দেশনা মোতাবেক প্রচার করার কাজটি হয়ে যায়। সেই সঙ্গে পরবর্তী উত্তরাধিকারেরাও ইসলামের এই মৌলিক আচারাদি সম্পর্কে অবগত হওয়ার সুযোগ পায়।

বিয়েতে দুটো পর্ব। প্রথম যেখানে বিয়ের মূল কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হবে, সেখানে পরবর্তী প্রজন্মকে দর্শক হিসেবে রাখতে হবে। আর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর যে আনন্দ আয়োজন সেখানে তাদের ইতিবাচক অংশগ্রহণ থাকা জরুরি। যারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন সেই স্বামী-স্ত্রীর জন্যও বিয়ের আয়োজনটি সৌভাগ্যের। কেননা, সেখানে তাদের অনেক আত্মীয়স্বজন ও পরিজন অংশ নেয়। আগত সকল মেহমান নতুন দম্পতির জন্য দুআ করেন। তাদের নেক দাম্পত্য জীবন, সফলতা এবং উন্নতির জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করেন।

খাদিমে রাসূল আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, "রাসূল সা. একদিন আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা.-এর কাপড়ে হলুদ রঙের চিহ্ন দেখতে পেয়ে বললেন, 'এটা কী?' আবদুর রহমান রা. উত্তর দিলেন, 'আমি এক মহিলাকে একটি খেজুরের আঁটি পরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে বিয়ে করেছি।' নবি সা. বললেন, 'আল্লাহ তায়ালা তোমার এ বিয়েতে বারাকাহ দান করুন। তুমি একটি ছাগল দিয়ে হলেও ওয়ালিমার আয়োজন করো'।"

বর্তমান সময়ে বিয়েশাদির অনুষ্ঠানে বিশাল জমকালো আয়োজন দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রেই এসব অনুষ্ঠানে খাওয়া-দাওয়া ও আয়োজনের যে বিশালতা থাকে, তা শরিয়তের বেঁধে দেওয়া সীমানাকে অতিক্রম করে যায়। অনেকেই এই বিয়েশাদির অনুষ্ঠানকে সামাজিক স্ট্যান্ডার্ড তৈরির প্রতিযোগিতা হিসেবে গণ্য করেন। মুখে স্বীকার না করলেও প্রকৃত বাস্তবতা তেমনটাই বলা যায়। অন্যদিকে, যারা বিয়েতে দাওয়াত পেয়ে যাচ্ছে, তারাও এই ধরনের জমকালো আয়োজনের প্রশংসা করেন। কার বিয়েতে কত লোক খেয়েছে, কার আয়োজন কত বেশি চোখ ধাঁধাল– এগুলো নিয়েই তারা গালগপ্পে মেতে ওঠেন। অথচ ইসলামের নির্দেশনা এর বিপরীত।

আবদু ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, "রাসূলে কারিম সা. দুই প্রতিদ্বন্দ্বী অহংকারকারীর খাদ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। কেননা, এর মধ্যে রিয়া তথা মানুষকে দেখানোর মানসিকতাই বিদ্যমান থাকে।" *আবু দাউদ : ৩৭৫৪*

৯.২ বিয়েতে অংশ নেওয়ার আদব

যদি আপনাকে বিয়ের দাওয়াত দেওয়া হয়, তা হলে হাসিমুখে ও আনন্দচিত্তে উক্ত অনুষ্ঠানে আপনি অংশ নিতে পারেন। রাসূল সা. তাঁর উম্মাহর জন্য এরকম নির্দেশনাই দিয়ে গেছেন। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, "যে ওয়ালিমায় কেবল ধনীদের দাওয়াত করা হয় এবং গরিবদের দাওয়াত করা হয় না, সেই ওয়ালিমা সবচেয়ে নিকৃষ্ট। আর যে ব্যক্তি দাওয়াত কবুল করে না, সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সঙ্গে অবাধ্যতা করে।" *মুসলিম : ১৪৩২*

ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সা. বলেছেন, "যদি তোমাদের বিয়ে অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেওয়া হয়, তবে তা রক্ষা করো।"

এই ধরনের আয়োজনে যাওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক পোশাক পরিধান করুন। রাসূল সা.-এর সাহাবিরা সব সময় বিয়ের আয়োজনে উত্তম পোশাক পরে যেতেন।

যদি সেখানে গিয়ে কারও সাথে কথা বলেন, তা হলে এমন কথা বলবেন যা বিয়ের আনন্দঘন উৎসবের সাথে সংগতিপূর্ণ হয়। এমন কোনো কথা বলবেন না, যাতে বিয়ের উৎসব আয়োজনটি বিষাদে ছেয়ে যায়। এসব অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে অনেক বেশি বিবেচক ও সহনশীল হওয়া মুসলিমের নৈতিক দায়িত্ব। বিয়ের অনুষ্ঠানে যাওয়ার ব্যাপারে মহিলা ও শিশুদের ব্যাপক আগ্রহ দেখা যায় এবং রাসূল সা. তাদেরকে এই আনন্দ আয়োজনে অংশ নেওয়ার বিষয়ে অনুমোদনও দিয়েছেন।

আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল সা. কিছু মহিলা এবং শিশুকে বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে আনন্দচিত্তে ফিরতে দেখলেন। তিনিও আনন্দে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, 'আল্লাহর নামে বলছি, তোমরা সকল মানুষের চেয়ে আমার কাছে প্রিয়।'

বর ও কনেকে তাদের নতুন জীবন শুরুর পথে অভিনন্দন জানাবেন। ইবনে মাজাহ ও তিরমিযিতে বর্ণিত হাদিসে পাওয়া যায়, নতুন দম্পতিকে উদ্দেশ্য করে রাসূল সা. বলতেন, بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ (আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জীবনকে বরকতময় করুন আর তোমাদেরকে কল্যাণের মধ্যে একত্রিত করুন)।" *তিরমিযি : ১০৯১, ইবনে মাজাহ : ২৯০৫*

ইসলাম আসার আগে জাহেলি যুগে আল্লাহর রহমত কামনা করা হতো না। বরং নতুন দম্পতি যেন আরামে ও সুখে থাকতে পারে এবং তাদের যেন অনেক

সন্তানাদি হয় সেই কামনা করা হতো। রাসূল সা. তা পরিবর্তন করে নতুন দম্পতির জন্য আল্লাহর রহমত কামনা করে দুআ করার প্রথা চালু করেন।

উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রা. বলেন, "যখন নবিজি সা. আমাকে বিয়ে করেন, আমার মা আমাকে আনসারদের একটি ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন, যেখানে আনসার মহিলারা আমাদের বিয়ে উপলক্ষ্যে আনন্দ উৎসব করছিল। আমি ভেতরে যাওয়ার পর তারা আমাকে অভিনন্দন জানায়, উপহার দেয় এবং শুভ কামনা করে দুআ করে।" আয়িশা রা. থেকে আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, "কোনো এক আনসার সাহাবির বিয়েতে আয়িশা রা. কনেকে সাজালে নবি সা. বললেন, 'হে আয়িশা! কোনো আনন্দ-ফূর্তির ব্যবস্থা করোনি? আনসারগণ এসব আনন্দ-ফূর্তি পছন্দ করে'।"

এই হাদিসটি থেকে বোঝা যায় যে, ইসলাম বিয়ে উপলক্ষ্যে মেয়েদের নিজ অঙ্গনে আনন্দ করা এবং সুন্দর সুন্দর শালীন গান গাওয়ার বিষয়টি অনুমোদন করে। তবে যে গানগুলো গাওয়া হবে বা যে কবিতাগুলো আবৃত্তি করা হবে, তা শালীন হওয়া অপরিহার্য। এমন কোনো গান গাওয়া যাবে না, যাতে শারীরিক ও যৌন কামনায় প্রভাব পড়ে। এমনভাবে গান গাওয়া বা নাচ করা যাবে না, যাতে মেয়েদের শারীরিক অবয়ব বোঝা যায়। বরং মার্জিত কিছু গান গাওয়া যায়, যাতে খুব সরলভাবে কেবল বিয়ের আনন্দটাই প্রকাশিত হয়; অন্য কোনো বাজে খায়েশ নয়।

অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া

১০.১ রোগী দেখতে যাওয়া

আপনার কোনো পরিজন, আত্মীয় ও পরিচিতজন অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাওয়া আপনার দায়িত্ব। এতে ইসলামের বন্ধন মজবুত হয় এবং ভ্রাতৃত্ববোধও শক্তিশালী হয়। একজন দায়িত্বশীল মুসলিম হিসেবে আল্লাহর প্রতিশ্রুত পুরস্কারকে ছোটো মনে করার কোনো সুযোগ নেই। সাওবান রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, "একজন মুসলিম অপর কোনো অসুস্থ মুসলিমকে দেখতে গেলে তিনি মূলত জান্নাতের খুরফায় চলে যান এবং বাড়ি ফিরে আসা অবধি তিনি সেই খুরফাতেই অবস্থান করেন। সাহাবিরা প্রশ্ন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, জান্নাতের খুরফা কী?' রাসূল সা. বললেন, 'খুরফা হলো সেই স্থান, যেখানে জান্নাতের ফসল রাখা হয়'।" *মুসলিম : ২৫৬৮*

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, "আল্লাহ (হাশরের মাঠে) বলবেন, 'আমি তোমার কাছে খাদ্য চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে আহার করাওনি।' বান্দা বলবে, 'হে প্রভু! আমি কীভাবে তোমাকে আহার করাতে পারি! অথচ তুমিই তো বিশ্বজাহানের প্রতিপালক।' আল্লাহ বলবেন, 'তুমি কি জানতে না, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট খাদ্য চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে আহার করাওনি। তুমি কি জানতে না, যদি তুমি তাকে আহার করাতে তবে তা আমার নিকট পেতে?'

'আদম সন্তান! আমি পিপাসার্ত হয়ে পানি চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে পান করাওনি।' বান্দা বলবে, 'হে রব! কেমন করে আমি তোমাকে পান করাতাম, অথচ তুমি বিশ্বজাহানের প্রতিপালক!' আল্লাহ বলবেন, 'আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে পান করাওনি। তুমি কি জানতে না, যদি তাকে পানি পান করাতে, তবে তা আমার নিকট পেতে?'

'আদম সন্তান! আমি রোগাক্রান্ত হয়েছিলাম, তুমি সেবা করোনি।' বান্দা বলবে, 'হে প্রভু! আমি কীভাবে তোমার সেবা করতে পারি, তুমি বিশ্বজাহানের রব।'

তিনি বলবেন, 'তুমি কি জানতে না, আমার অমুক বান্দা রোগাক্রান্ত হয়েছিল? তুমি যদি তার সেবা করতে, তবে তা আমার নিকট পেতে অথবা তুমি তার কাছেই আমাকে পেতে'।" *মুসলিম : ২৫৬৯*

ইমাম আহমাদ এবং ইবনে হিব্বান রহ. তাদের হাদিস গ্রন্থে আরেকটি হাদিস উল্লেখ করেন। রাসূল সা. বলেছেন, "কোনো ব্যক্তি যদি রোগী দেখতে যায়, তা হলে সে মূলত আল্লাহর নিয়ামতের দিকে অগ্রসর হয়। যতক্ষণ তিনি রোগীর পাশে থাকেন, তিনি সেই নিয়ামত পেতে থাকেন। বাড়িতে ফিরে আসা অবধি আল্লাহর নিয়ামত ও করুণা তাকে ঘিরে রাখে।"

আলী রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, "কেউ বিকেল বেলা কোনো রোগী দেখতে গেলে সত্তর হাজার ফেরেশতা তার সাথে রওনা হয় এবং তারা তার জন্য ভোর হওয়া পর্যন্ত ক্ষমা চাইতে থাকে। উপরন্তু তার জন্য জান্নাতে একটি বাগান তৈরি করা হয়। আর কোনো ব্যক্তি দিনের প্রথমভাগে রোগী দেখতে গেলে তার সাথেও সত্তর হাজার ফেরেশতা রওনা হয় এবং তারা সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। তার জন্যও জান্নাতে একটি বাগান তৈরি হয়।" *আবু দাউদ : ১৩৬৭*

১০.২ দুআ করা

রোগীর জন্য দুআ করা উচিত, যাতে তিনি দ্রুতই রোগমুক্তি লাভ করেন এবং অসুস্থ থাকাকালীনও আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন। দুআর কারণে অসুস্থ ব্যক্তি মানসিকভাবে দৃঢ়তা ও প্রশান্তি লাভ করেন। মা আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ সা.-এর নিয়ম ছিল, তিনি যখন কোনো রোগীর কাছে আসতেন কিংবা তাঁর নিকট যখন কোনো রোগীকে আনা হতো, তখন তিনি বলতেন, 'হে মানুষের রব! তার কষ্ট দূর করে দিন। তাকে আরোগ্য দান করুন, আপনিই একমাত্র আরোগ্যদানকারী। আপনার আরোগ্য ছাড়া অন্য কোনো আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য দান করুন, যা সামান্যতম রোগকেও অবশিষ্ট না রাখে'।" *মুসলিম : ২১৯১, আহমাদ : ২৪২৩০*

১০.৩ অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেলে কতটা সময় থাকবেন

রোগী দেখতে যাওয়ার পর ন্যূনতম কিছু আদব বজায় রাখলে গোটা সাক্ষাৎটি অনেক বেশি পরিচ্ছন্ন ও বরকতময় হয়ে উঠতে পারে। আপনার মূল দায়িত্ব হলো, রোগীর কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করা, অসুস্থতার পর নিয়ামত হিসেবে তিনি যে সুস্থতা লাভ করবেন, সে ব্যাপারে তাকে আশাবাদী ও সচেতন করে তোলা।

রোগী দেখার সময়টা দীর্ঘায়িত করবেন না। অসুস্থ ব্যক্তি খুব দীর্ঘ সময়ের সাক্ষাৎ দেওয়ার মতো অবস্থায় থাকেন না। জুমার দুই খুতবার মাঝে যেটুকু সময় বিরতি থাকে, রোগী সাক্ষাতের সময়টিও ততটুকু হওয়ায় বাঞ্ছনীয়। সাক্ষাৎটি এতটুকু সময়ের জন্য হবে যাতে রোগীকে সালাম দেওয়া যায়, তার অসুস্থতার খোঁজখবর ও সর্বশেষ খবরাখবর জানা যায় এবং তার সুস্থতা কামনায় দুআ করা যায়। বিদায় নেওয়ার পর আর এক মুহূর্তও রোগীর সামনে থাকা উচিত নয়; বরং তাকে তার মতো করে থাকার সুযোগ দেওয়া দরকার।

ইবনে আবদুল বার রহ. তাঁর ফিকহ গ্রন্থের শেষাংশে বলেন, "আপনি কোনো সুস্থ বা অসুস্থ মানুষ– যাকেই দেখতে যান না কেন, আপনি সেখানেই বসবেন, যেখানে আপনাকে বসতে বলা হবে। কেননা, যার বাড়ি তিনি ভালো জানেন যে কীভাবে তার ঘরের গোপনীয়তা সংরক্ষণ করতে হয়। অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া সুন্নাত। সবচেয়ে উত্তম সাক্ষাৎ হলো, স্বল্পমেয়াদি সাক্ষাৎ। যিনি রোগী দেখতে যাবেন, তার বেশি সময় নেওয়া উচিত নয়। যদি রোগী তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা আত্মীয় হয় এবং সে তার সাক্ষাৎটি উপভোগ করে তা হলে ভিন্ন কথা।"

১০.৪ রোগীকে দেখার আদব

রোগী দেখতে যাওয়ার সময় পরিষ্কার পোশাক পরিধান করবেন। গায়ে সুগন্ধি ব্যবহার করা যেতে পারে। তা হলে রোগী আধ্যাত্মিক ও শারীরিকভাবে স্বস্তি অনুভব করবেন। তবে খুব কড়া মানের সুগন্ধি ব্যবহার না করাই শ্রেয়। কেননা, তাতে রোগী বিরক্ত হতে পারেন। রোগী দেখতে যাওয়ার সময় খুব আমুদে বা উৎসব উপযোগী পোশাক পরা উচিত নয়। কেননা, এই ধরনের পোশাক আনন্দ উৎসব আয়োজনের জন্যই বেশি মানানসই। বরং সাধাসিধা পরিচ্ছন্ন সিদ্ধ পোশাক বাছাই করবেন।

রোগী দেখতে গেলে কথাবার্তা খুবই হালকা মানের হওয়া উচিত। এমন কোনো কথা বলা উচিত নয়, যাতে রোগীর মন খারাপ হয়ে যায় কিংবা তার মনে হতাশা ভর করে। এরকম সাক্ষাতের ক্ষেত্রে রোগীকে কোনো খারাপ সংবাদ দেওয়া উচিত নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ব্যবসার অবস্থা খুব খারাপ কিংবা কারও মৃত্যু সংবাদ দেওয়া মোটেও উচিত নয়।

সাক্ষাৎ করতে গেলে রোগীর অসুখের বিস্তারিত জানতে চাওয়াও ঠিক নয়। সাক্ষাৎপ্রার্থী যদি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হয় তা হলে অবশ্য ভিন্ন কথা। ঠিক একইভাবে, ভালো জানাশোনা না থাকলে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে রোগীকে কোনো

খাবার বা ওষুধ খাওয়ার পরামর্শ দেওয়াও ঠিক নয়। এটা তারাই বলতে পারেন যারা বিষয়টি সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন। না জেনে পরামর্শ দিয়ে বসলে তাতে বরং রোগীর ক্ষতি হতে পারে। রোগটি আরও জটিলতর হয়ে শেষে রোগী মারাও যেতে পারেন।

একজন ডাক্তার হয়তো একভাবে রোগীর চিকিৎসা করছেন। রোগী দেখতে গিয়ে কারও সেই চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে আপত্তি তোলা বা সমালোচনা করা ঠিক নয়। কেননা, এতে রোগীর মনে তার চিকিৎসা সম্বন্ধে সংশয়ের সৃষ্টি হতে পারে। যদি আপনি নিজেই চিকিৎসক হন, তা হলে এই ধরনের আলাপ করতে পারেন। তবে তা রোগী বা রোগীর অ্যাটেনডেন্টদেন সাথে না করে বরং সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের সঙ্গে করাই বাঞ্ছনীয়।

১০.৫ একজন রোগী কীভাবে নিজের অবস্থা বর্ণনা করবেন

একজন রোগীর কাছে কেউ যদি শারীরিক অবস্থা জানতে চায়, তা হলে সর্বাগ্রে সেই অসুস্থ মানুষটির উচিত আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে তারপর তার অবস্থা বর্ণনা করা। যদি এই পথে না গিয়ে রোগী সরাসরি অভাব-অভিযোগ শুরু করে, তা হলে মনে হতে পারে যে, রোগী আল্লাহর ফয়সালার বিরুদ্ধেই অভিযোগ করছেন। রাসূল সা. এবং তাঁর সাহাবিগণ তো বটেই এমনকি তাবেয়িগণও এই রীতিরই অনুসরণ করেছেন।

আবদুর রহমান আত তাবিবের জীবনীগ্রন্থতেও এই ধরনের অনুশীলনের তথ্য পাওয়া যায়। আবদুর রহমান আত তাবিব ছিলেন ইমাম আহমাদ এবং বিশর আল হাফির ব্যক্তিগত চিকিৎসক। আবদুর রহমান বলেন, “একবার ইমাম আহমাদ ও বিশর আল হাফি একইসাথে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাদেরকে একই স্থানে চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছিল। যখন আমি বিশরকে দেখতে গেলাম এবং তাঁর অবস্থা জানতে চাইলাম, তিনি প্রথম আল্লাহকে ধন্যবাদ জানালেন। তারপর তিনি বললেন, ‘আমি শরীরের অমুক স্থানে ব্যথা অনুভব করছি।’

এরপর আমি যখন ইমাম আহমাদকে দেখতে গেলাম এবং জানতে চাইলাম, তিনি কেমন বোধ করছেন। উত্তরে ইমাম আহমাদ রহ. বললেন, ‘আমাদের ভাই বিশর তো আরও অসুস্থ।’ আমি যখন আবার সুনির্দিষ্টভাবে তাঁর অবস্থা জানতে চাইলাম, তখন তিনিও প্রথম আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন এবং তারপর নিজের অবস্থা জানালেন।”

ইবনে শিরিন রহ.-এর বর্ণনানুযায়ী, "যদি কেউ আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তারপর তার অভিযোগ বর্ণনা করে, তা হলে এটা আর অভিযোগ থাকে না; বরং বিষয়টি এমন হয় যে, বান্দা তার রব আল্লাহ তায়ালার একটি ফয়সালার বর্ণনা দিচ্ছেন।"

উপরোক্ত বর্ণনাগুলোর আলোকে দেখা যাচ্ছে যে, একজন রোগীর সবার আগে আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত এবং তারপর অভিযোগগুলো প্রকাশ করা উচিত। এমনটা হলে আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার দায় বান্দার ওপর পড়বে না।

শোক প্রকাশ করা

১১.১ কোনো খারাপ সংবাদ জানানোর নিয়ম

যদি আপনাকে অপ্রত্যাশিত কোনো খারাপ সংবাদ বা মর্মান্তিক দুর্ঘটনার খবর জানাতে হয় অথবা আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবের মৃত্যু সংবাদ জানাতে হয়, তাহলে এমনভাবে সংবাদ অন্যদের জানান, যাতে এই সংবাদের খুব একটা নেতিবাচক প্রভাব শ্রোতাদের ওপর না পড়ে। যতটুকু পারা যায় কোমলভাবে সংবাদটি জানানোর চেষ্টা করুন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মৃত্যু সংবাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন, "এই কয়েকদিন আগে আমি শুনলাম যে, অমুক খুব অসুস্থ এবং তার শারীরিক অবস্থার ক্রমশই অবনতি হচ্ছে। আর একটু আগে শুনলাম তিনি ইন্তেকাল করেছেন। আল্লাহ তাকে মাফ করে দিন এবং জান্নাত নসিব করুন।"

কিন্তু যদি আপনি শুরুতেই কাউকে ভড়কে দেন, তাহলে প্রভাবটিও নেতিবাচক হতে বাধ্য। যেমন আপনি যদি এভাবে বলেন, 'জানেন, আজ কে মারা গেছে?' এই ধরনের ভঙ্গি শ্রোতাদের আতঙ্কিত করে তোলে এবং তারা খুব খারাপ সংবাদ কল্পনা করতে শুরু করে। সেই ব্যক্তি হয়তো তার আপন কোনো অসুস্থ লোককে নিয়ে নেতিবাচক চিন্তা করতে শুরু করে দেবে। তাই মৃত ব্যক্তির নামটিও শুরুতে বলে দেওয়াই উত্তম। তাহলে সংবাদের খারাপ প্রভাব কম হয়। তখন শ্রোতা ব্যক্তি হয়তো আর আকাশকুসুম কল্পনা করার সুযোগ পাবেন না এবং মৃত্যু সংবাদটিও তার জন্য অনেকটাই সহনীয় মনে হবে।

ঠিক একইভাবে অগ্নিকাণ্ড, পানিতে ডুবে মরা কিংবা সড়ক দুর্ঘটনার খবর জানাতে চেষ্টা করুন। শ্রোতাকে এমনভাবে প্রস্তুত করে তারপর খবরটি দিন, যাতে দুর্ঘটনার সংবাদ তার জন্য সহনীয় হয়। ভিকটিম মানুষের নামও এমনভাবে বলুন, যাতে তার প্রতি শ্রোতাদের সহানুভূতি হয়। তাই বলে শ্রোতাদেরকেই ঘাবড়ে দিয়ে তাদেরকেই অসুস্থতার ঝুঁকিতে ফেলবেন না। এটা মনে রাখবেন, সকল শ্রোতার মন একই রকম শক্ত বা মজবুত হয় না। কারও কারও মনে নেতিবাচক সংবাদের প্রভাব খুবই খারাপভাবে পড়ে।

যদি কাউকে দুঃসংবাদ জানাতেই হয়, তাহলে এ জন্য সঠিক সময় বেছে নিন। খাওয়ার সময় বা ঘুমানোর ঠিক আগ মুহূর্তে কিংবা অসুস্থতার সময় খারাপ খবর না দেওয়াই ভালো। যেকোনো খারাপ বা জটিল পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার জন্য আবেগ-অনুভূতির পাশাপাশি হিতাহিত জ্ঞানও থাকা চাই।

১১.২ শোক প্রকাশ করার সৌজন্যতা ও কর্তব্য

যদি আপনার কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা আত্মীয় মারা যায়, তা হলে জলদি আপনার শোক ও সমবেদনা জানিয়ে দিন। কারণ, আপনার বন্ধু, আত্মীয় বা পরিজন– আপনারই অংশ। তাই তাদের দুঃসময়ে পাশে থাকা বা কষ্ট লাঘব করা আপনার নৈতিক দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। মৃত ব্যক্তির জানাজায় ও দাফন কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার যথাসম্ভব চেষ্টা করুন। এর মাধ্যমে যেমন মৃত ব্যক্তি ও তার স্বজনদের প্রতি আপনার সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ পায়, একই সঙ্গে এ কাজে শরিক থাকতে পারলে মানুষ মৃত্যুর অপরিহার্যতা অনুধাবন করতে পারে এবং তা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার সহায়ক হয়।

বুখারি ও মুসলিমের একটি বহুল পঠিত হাদিস, রাসূল সা. বলেছেন, "একজন মুসলিমের ওপর অপর মুসলিমের সাতটি অধিকার রয়েছে–

(১) রোগী দেখতে যাওয়া
(২) জানাজার অনুসরণ করা
(৩) হাঁচির জবাব দেওয়া
(৪) দুর্বলকে সাহায্য করা
(৫) নির্যাতিত ব্যক্তির সাহায্য করা
(৬) সালাম প্রচার করা এবং
(৭) শপথকারীর শপথ পূরণ করা।

ইমাম আহমাদ রহ. উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূল সা. বলেছেন, "তোমরা নিয়মিতভাবে অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাবে এবং জানাজায় অংশ নেবে। এতে পরকালীন জীবন তোমাদের স্মরণে থাকবে।"

শোক প্রকাশ করলে বা সহানুভূতি জানালে দুঃসময়ে থাকা মানুষগুলো একটু হলেও স্বস্তি অনুভব করেন এবং তাদের কষ্ট সামান্য হলেও লাঘব হয়। এই সময়, তাদেরকে ধৈর্যধারণ করার পরামর্শ দেওয়া যায়। কারণ, আল্লাহ ধৈর্যশীলদের জন্য উত্তম পুরস্কার নির্ধারণ করে রেখেছেন। কুরআনে হাকিমে আল্লাহ পাক বলেন,

অবশ্যই আমি তোমাদের ভয়, ক্ষুধা, সম্পদ ও জীবনের ক্ষতি এবং ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে পরীক্ষা করব। আর সবরকারীদের জন্য সুসংবাদ। যখন তারা বিপদে পড়ে, তখন বলে, 'নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই কাছে ফিরে যাব।' তাদের প্রতি তাদের রবের পক্ষ থেকে সালাত ও রহমত বর্ষিত হয়। আর তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।" *সূরা বাকারা : ১৫৫-১৫৭*

মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ করে এবং তাকে ক্ষমা করে দেওয়ার মাধ্যমেও শোক প্রকাশ করা যায়। আর এই আমলগুলো শোক প্রকাশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। কেননা, মৃত ব্যক্তিরা এই সব আমলের উপকারিতা ভোগ করতে পারে। কারও দুঃখে শোক জানালে বা সহানুভূতি প্রকাশ করলে মূলত তার কষ্টের সময়ের ভাগ নেওয়া হয়।

ইবনে মাজাহ ও *বায়হাকি*-তে উদ্ধৃত একটি হাদিসে রাসূল সা. বলেছেন, "যে মুসলিম দুর্দশায় থাকা অপর মুসলিমের প্রতি শোক ও সহানুভূতি প্রকাশ করে, তার জন্য শেষ বিচারের দিন আল্লাহ উত্তম পুরস্কার নির্ধারণ করে রেখেছেন।"

১১.৩ শোক প্রকাশ

যদি আপনি আপন কোনো আত্মীয়, বন্ধু বা পরিচিতজনের জন্য শোক প্রকাশ করতে চান, তাহলে ভিকটিমের জন্য দুআ করুন। এটা খুবই উত্তম একটি আমল। উম্মে সালামা রা.-এর স্বামী যখন ইন্তেকাল করেন, তখন উম্মে সালামাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য রাসূল সা. একটি দুআ পাঠ করেছিলেন। মুসলিম শরিফে এই হাদিসটি উল্লিখিত রয়েছে। রাসূল সা. বলেছিলেন, "হে আল্লাহ! আপনি আবু সালামাহকে ক্ষমা করে দিন। তাকে হিদায়াতপ্রাপ্ত লোকদের মাঝে শামিল করুন। যে পরিবারকে তিনি দুনিয়ায় রেখে গেলেন আপনি তাদের অভিভাবক হয়ে যান। হে বিশ্বজাহানের প্রতিপালক! আমাদের সবাইকে এবং আবু সালামাহকে আপনি ক্ষমা করে দিন। তাকে কবরে শান্তি দান করুন এবং সেখানে তার বসবাসকে আলোকিত করে দিন।"

মৃত ব্যক্তির পরিজন যারা সেই মুহূর্তগুলো খুবই কষ্টে পার করছেন তাদের সাথে এমনভাবে কথা বলুন– যাতে তাদের কষ্ট লাঘব হয়, তারা ধৈর্যধারণে উদ্বুদ্ধ হয়। তারা যেন অনুধাবন করতে পারে যে, আমরা সবাই এই পৃথিবীতে ক্ষণিকের অতিথি আর পরকালীন জীবনটাই চিরস্থায়ী।

এই প্রসঙ্গে, কুরআনের কিছু আয়াত, রাসূল সা.-এর কিছু হাদিস এবং আমাদের সোনালি যুগের কীর্তিমান মানুষদের শোক প্রকাশের কিছু ঘটনাকে আমরা উদাহরণ হিসেবে সামনে নিয়ে আসতে পারি। যেমন : কুরআন মাজিদে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেন,

> "সুসংবাদ দাও সবরকারীদের। যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই কাছে ফিরে যাব। তারাই সেসব লোক, যাদের প্রতি তাদের রবের পক্ষ থেকে সালাত ও রহম বর্ষিত হয়। আর তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।" *সূরা বাকারা : ১৫৫-১৫৭*

আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজিদে আরও বলেন,

> "প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আর তোমরা কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণভাবে সবকিছুর প্রতিদান পাবে। তারপর যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সেই হবে সফলকাম।" *সূরা আলে ইমরান : ১৮৫*

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা আরও বলেন,

> "যা কিছু আছে সবই বিলীন হয়ে যাবে, বাকি থাকবে কেবল তোমার মহামর্যাদাবান, মহানুভব প্রভুর সত্তা।" *সূরা রহমান : ২৬-২৭*

রাসূল সা.-এর কিছু হাদিস এই মর্মে উল্লেখ করা যায়। *সহিহ মুসলিম* ও *ইবনে মাজাহ*-র বর্ণনানুযায়ী, রাসূল সা. প্রায়শই দুআ করতেন, "হে আল্লাহ! আমার ওপর নির্ধারিত বিপদের বিনিময়ে আমাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। আমি যা হারিয়েছি, তার পরিবর্তে আমার জন্য আরও ভালো প্রতিদান নির্ধারণ করুন।" *ইবনে মাজাহ : ১৫৯৮*

আমাদের পূর্বসূরি কীর্তিমান মনীষীদের শোকপ্রকাশের ধরনও এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়। সাইয়িদুনা উমর ইবনে খাত্তাব রা. প্রায়শই বলতেন, "প্রতিদিনই আমরা খবর পাই, অমুক অমুক ব্যক্তি মারা গেছেন। কোনো একদিন এমনও বলা হবে, উমর মারা গেছে।"

আমিরুল মুমিনিন উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. বলতেন, "আদম সন্তান মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তার আসল ঠিকানায় পৌঁছে যায়, শিকড়ের আরও গভীরে তার ঠাঁই হয়।"

প্রখ্যাত তাবেয়ি হাসান বসরি রহ. বলে গেছেন, "হে আদম সন্তান, তোমরা হলে কিছু দিনের সমষ্টি। একটি দিন চলে যাওয়া মানে, তোমার থেকেই কিছু অংশ চলে যাওয়া। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন, বিশ্বাসী ব্যক্তিদের স্থায়ী ঠিকানা হলো জান্নাত।"

হাসান বসরির ছাত্র মালিক বিন দিনার রহ. বলতেন, "আল্লাহকে যারা ভয় করে তাদের জন্য শেষ বিচারের দিনই হবে উৎসবের দিন।"

শোক প্রকাশ নিয়ে এতগুলো কথা বললাম। কেননা, আমি নিজেই কঠিন পরিস্থিতিগুলোতে অনেককে অনর্থক কথা বলতে শুনেছি। তারা সহানুভূতি প্রকাশ করার নামে এমন সব কথা বলেন, যা কষ্টকর সেই ক্ষণগুলোর সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। শোকাহত অন্তরগুলো এমনিতেই কষ্টে ও বিপর্যয়ের মধ্যে ডুবে থাকে। তাই শোকগ্রস্ত লোকদের সাথে কথা বলার জন্য যৌক্তিক ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলিই নির্বাচন করুন।

শোকার্ত পরিবারগুলো আল্লাহ তায়ালার রহমত পাওয়ার আশায় উজ্জীবিত হয়ে উঠবেন– এরকম কথা বলুন। মানসুর বিন জাজান রহ. বলেন, "দুঃখ ও কষ্ট মানুষের জন্য উত্তম প্রতিদান নিয়ে আসে। বিপদে ধৈর্য ধরলে বান্দার জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার।"

হাসান বসরি রহ. সব সময়ই বলতেন, "কষ্টের সময় একদিন শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু এই সময়ে আমরা আল্লাহর ওপর ভরসা হারিয়ে যে পাপগুলো করি, সেগুলো ঠিকই টিকে থাকবে।"

১১.৪ ফুল পাঠানো এবং কুরআনখানি

এখানে উল্লেখ্য যে, অনেকেই মৃত ব্যক্তিকে দেখতে গেলে ফুল নিয়ে যায় এবং কফিনের ওপর পুষ্পস্তবক প্রদান করে সম্মান জানায়। এমনকি মৃত ব্যক্তির বাসাতেও ফুল পাঠায়। এই ফুলগুলো তারা সম্মান ও সহানুভূতি প্রকাশের অংশ হিসেবেই এভাবে প্রেরণ করেন। তবে ইসলাম এই ধরনের কার্যক্রম অনুমোদন করে না। কারও জানাজায় ফুল নিয়ে যাওয়া বা মৃত ব্যক্তির বাড়িতে ফুল পাঠানোর নিয়ম ইসলামে নেই। এগুলো সবই অমুসলিমদের সংস্কৃতি, যা পরিহার করা উচিত। যারা এই কাজগুলো করেন, তারা এর বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে ন্যূনতম পুরস্কার বা প্রতিদানও পাবে না। বরং এই ধরনের গর্হিত কাজ করার দায়ে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

আরেকটি বাজে চর্চা ইদানীং শুরু হয়েছে। তা হলো মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মাননা জানানো, এগুলো সরাসরি সম্প্রচার করা, যেই গাড়িতে করে কফিন বহন করে নিয়ে যাওয়া হবে তাও সম্প্রচার করা, মাইকে কুরআন তিলাওয়াতের অডিও রেকর্ড ছেড়ে দেওয়া ইত্যাদি। এগুলো হওয়া অনুচিত। মৃত ব্যক্তির জানাজা ও অন্যান্য কার্যক্রমের ভেতর গাম্ভীর্যতা, নম্রতা, আল্লাহর জিকির এবং দুআর উপস্থিতি থাকাই বাঞ্ছনীয়। আর কিছু নয়। মৃতদেহের পাশে কোনো বিষাদের সুর বাজানো উচিত নয় কিংবা কোনো বিশেষ স্লোগান তোলারও কোনো প্রয়োজন নেই। এই বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকার সতর্কতামূলক বার্তা ব্যাপক পরিমাণে মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে দেওয়া দরকার।

ঘুমানোর আদব

১২.১ ঘুমানোর প্রস্তুতি

কুরআনে হাকিমে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেন,

> "তাঁর আরও একটি নিদর্শন হলো রাত ও দিনে তোমাদের ঘুম এবং আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে তোমাদের (জীবিকা) অন্বেষণ।"
> *সূরা রূম : ২৩*

তিনি আরও বলেন,

> "তোমাদের ঘুমকে করেছি ক্লান্তি দূরকারী, রাত্রিকে করেছি আবরণ।"
> *সূরা নাবা : ৯-১০*

ঘুম মানুষের একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ঘুমানোর ক্ষেত্রেও সুন্নাহ থেকে সুন্দর আদব ও শিষ্টাচারের নির্দেশনা পাওয়া যায়। সাধারণভাবে আমরা ঘুমাতে যাওয়ার বিষয়টিকে অত্যন্ত হালকা বিষয় মনে করলেও প্রকৃতপক্ষে এই সময়েও বেশ কিছু আমল আছে, যা আমাদের নিয়মিত অনুশীলন করা উচিত।

ঘুমাতে যাওয়ার আগে ভালোভাবে পবিত্র হওয়া জরুরি। সব সময় ডান কাত হয়ে শোয়ার অভ্যাস করতে হবে। বারা ইবনু আযিব রা. থেকে বর্ণিত, একদিন রাসূলুল্লাহ সা. আমাকে বললেন, "যখন রাতে ঘুমানোর প্রস্তুতি নেবে, তখন নামাজের অজুর মতো অজু করে ডান কাতে শুয়ে বলবে, 'হে আল্লাহ! আমি নিজেকে আপনার নিকট সমর্পণ করলাম এবং অনুগত হলাম। আমার কাজ আপনার ওপর ন্যস্ত করলাম, আমার পিঠ আপনার নিকট সোপর্দ করলাম এবং আপনার প্রতি আগ্রহে ও ভয়ের সাথে আপনার সাহায্যের প্রতি ভরসা করলাম। আপনি ছাড়া অন্য কোথাও মুক্তি ও নিরাপত্তার স্থান নেই। আমি আপনার সেই কিতাবে বিশ্বাস করি, যা আপনার প্রেরিত নবির ওপর অবতীর্ণ করেছেন।" অতঃপর নবি সা. বলেন, "এভাবে (ওই রাতে) যদি তোমার মৃত্যু হয়, তাহলে তুমি ইসলামের ওপরেই মারা গেলে। এটাই হবে তোমার সর্বশেষ কথা।"
বুখারি : ২৪৭, মুসলিম : ২৭১০

বিছানায় শোয়ার আগে ভালোমতো গায়ের পোশাক এবং শোয়ার বিছানা-দুটোই ভালোভাবে ঝেড়ে নেওয়া উচিত। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ তার বিছানায় বিশ্রাম নেয়, সে যেন তার পরিধেয় বস্ত্রের ভেতরের দিক দিয়ে বিছানা ঝেঁড়ে নেয়। কেননা, সে জানে না তার চলে যাওয়ার পর বিছানায় কী এসেছে।" *মুসলিম : ২৭১৪, আহমাদ : ৭৭৫২*

শোবার ঘর, ঘুমের সময় পাশে থাকা সঙ্গীকে কেন্দ্র করে আমাদের এখানে প্রায়শই ঘরের ভেতর অনেক মন্দ ঘটনা এমনকি যৌন হয়রানি ঘটনা শোনা যায়। অনেক সময় আমাদের পরিচিত অনেকের সন্তানরাও নানা ধরনের বাজে অভিজ্ঞতার শিকার হয়। অথচ এর সহজ সমাধান ইসলাম অনেক আগেই দিয়ে দিয়েছে। আমর ইবনু শুআইব রহ. তাঁর পিতা থেকে ও তিনি তাঁর দাদার থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছর হলে তাদেরকে সালাতের জন্য নির্দেশ দাও। যখন তাদের বয়স দশ বছর হয়ে যাবে তখন (সালাত আদায় না করলে) তাদেরকে শাসন করবে এবং তাদের বিছানা আলাদা করে দেবে।" *আবু দাউদ : ৪৯৫*

ক্লান্তি বা অন্য কারণে রাতের নামাজ পড়ার সময় কারও কারও ঘুম আসতে পারে। সেই সময়, অনেকে জোর করে জেগে থেকে নামাজ আদায় করে, যা কাম্য নয়। কেননা, এতে নামাজের হক নষ্ট হয়। বরং ঘুম এলে অল্প পরিমাণে ঘুমিয়ে নেওয়াই উচিত। উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, "যখন নামাজ পড়া অবস্থায় তোমাদের কারও ঘুম আসবে, তখন তার ঘুমিয়ে যাওয়া উচিত, যতক্ষণ না তার ঘুম চলে যাবে। কারণ, তোমাদের কেউ যদি তন্দ্রা অবস্থায় নামাজ পড়ে, তাহলে সে বুঝতে পারবে না যে সম্ভবত সে ক্ষমা প্রার্থনা করতে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে নিজেকে যেন গালি দিয়ে দিচ্ছে।" *বুখারি : ২১২, মুসলিম : ৪৮৬*

অনেকেরই উপুড় হয়ে শোয়ার অভ্যাস থাকে। তবে হাদিসের বর্ণনানুযায়ী, উপুড় হয়ে শোয়ার ব্যাপারে রাসূল সা. নিরুৎসাহিত করেছেন। ঘুমাতে যাওয়ার আগে ঘরের দরজা বন্ধ আছে কিনা ও লাইটগুলো (বাতি) ভালোমতো নেভানো হয়েছে কিনা তা দেখে নেবেন।

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন, "তোমরা (রাতে ঘুমানোর পূর্বে) ঘরের দরজাগুলো বন্ধ করো, পানির পাত্রের মুখ ঢেকে বা

বেঁধে দাও, থালাগুলো উপুড় করে রেখো বা ঢেকে দিয়ো এবং আলো নিভিয়ে দিয়ো। কেননা, শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না, পাত্রের বন্ধ মুখ খুলতে পারে না এবং উপুড় করা বা ঢেকে দেয়া থালাও উন্মুক্ত করতে পারে না। আর (বাতি না নেভালে) দুষ্ট ইঁদুর মানুষের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতে পারে।" *বুখারি, মুসলিম*

হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত, "নবি সা. ঘুমানোর সময় বলতেন, اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وأَحْيا (হে আল্লাহ! আমি আপনার নামে মরি ও বাঁচি)। তিনি যখন জাগতেন তখন বলতেন, الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وإِلَيْهِ النُّشُورُ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের মৃত্যুর পর পুনারায় জীবিত করবেন।)"

১২.২ ঘুম থেকে উঠার পরে যা করণীয়

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "তোমাদের কেউ ঘুম হতে জেগে উঠলে অজুর পাত্রে হাত দেওয়ার আগে হাত ধুয়ে নেবে। কেননা, তার জানা নেই যে, তার হাত কোথায় রাত্রি যাপন করেছে।" *বুখারি : ১৬২, মুসলিম : ২৭৮*

উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রা. বলেন, "নবি সা. যখনই ঘুম থেকে জাগতেন, অজুর পূর্বে মিসওয়াক করতেন।"

হযরত মুআয ইবনু জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, "যে মুসলিম রাতে পাক-পবিত্র অবস্থায় আল্লাহর যিকর করে ঘুমিয়ে যায়, তারপর রাতেই জেগে উঠে আল্লাহর নিকট কল্যাণ কামনা করে, আল্লাহ তাকে (দুনিয়া ও আখিরাতে) অবশ্যই কল্যাণ দান করেন।" *আবু দাউদ : ৫০৪২*

শারিক আল হাওযানি রহ. বর্ণনা করেন, "আমি উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রা.-এর নিকট গিয়ে প্রশ্ন করেছি, 'রাসূলুল্লাহ সা. রাত্রে ঘুম থেকে সজাগ হওয়ার পর কোন বিষয় দিয়ে ইবাদত আরম্ভ করতেন?' তখন আয়িশা রা. বললেন, 'তুমি আমাকে এমন বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছ, যা তোমার পূর্বে আমাকে কোনো লোক জিজ্ঞেস করেনি। তিনি রাত্রে ঘুম থেকে জেগে উঠার পর প্রথম দশবার *আল্লাহু আকবার* পাঠ করতেন। *আলহামদু লিল্লাহ* বলতেন দশবার। *সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী* পাঠ করতেন দশবার। *সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস*

পাঠ করতেন দশবার। *আসতাগফিরুল্লাহ* পাঠ করতেন দশবার। *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ* পাঠ করতেন দশবার। আর দশবার পড়তেন এ দুআ, *আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন যীকিদ দুন্‌ইয়া ওয়া যীকি ইয়াওমিল কিয়ামাহ*। এরপর তিনি (তাহাজ্জুদের) সালাত আরম্ভ করতেন'।" *আবু দাউদ : ৫০৮৫*

ঘুমের আগে কোনো নামাজ বাদ গেলে বা ঘুমের কারণে কোনো নামাজ না পড়তে পারলে ঘুম থেকে উঠেই সেই নামাজগুলো পড়ে নেওয়া জরুরি। আবু সাঈদ খুদরি রা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "যে ব্যক্তি বিতর না পড়ে ঘুমিয়ে গেল বা তা পড়তে ভুলে গেল, সে যেন ভোরবেলা অথবা যখন তার স্মরণ হয় তখন তা পড়ে নেয়।" *আবু দাউদ : ১৪৩১, তিরমিযি : ৪৬৫*

সর্বশেষ কিছু কথা

এই বইতে আমরা সংক্ষেপে ইসলামের কিছু আদব ও শিষ্টাচার তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, যা আমাদের পূর্ববর্তীগণ আমল করে গেছেন। আমরা এমনভাবে বিষয়গুলো উপস্থাপন করতে চেয়েছি, যাতে সকলের জন্য বুঝতে সুবিধা হয় এবং সবাই যেন স্বাচ্ছন্দ্যে এই আদবগুলো অনুশীলন করতে পারেন।

এই আদব ও শিষ্টাচারগুলো অনুশীলন করার সর্বোত্তম স্থান হলো আপনার নিজের ঘর। এরপর পর্যায়ক্রমে পরিচিত অন্য সবার ঘরেও এগুলোর নিয়মিত চর্চা করা দরকার। পরিবার ও সহকর্মী মুসলিম ভাই-বোনদের সাথে আদব রক্ষা করার ব্যাপারে আমরা ততটা তৎপর হই না; যদিও সেখানেই আমাদের বেশি সতর্কতা অবলম্বন করার প্রয়োজন ছিল।

তাই সঠিক ও যথাযথ লোকদের সাথে এই আদব বজায় রাখার বিষয়ে কোনো অবহেলা করবেন না। সবার সাথে সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ করুন। যদি আপনার ব্যবহার ভালো না হয়, আপনি নিজেই অসম্মান ডেকে নিয়ে আসবেন। সেই সাথে এর মাধ্যমে আপনার ওপর অর্পিত দায়িত্বের বিষয়ে আপনি অবহেলা করবেন এবং রাসূল সা.-এর নির্দেশনাকে অবজ্ঞা করবেন। তাই শিষ্টাচারের বিষয়ে আমাদের সর্বোচ্চ পরিমাণ সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

আমরা আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা রেখে ইসলাম নির্দেশিত শিষ্টাচারগুলো বাস্তবজীবনে অনুশীলন করার চেষ্টা করে যাব। তাহলে আল্লাহই নেককার বান্দা হিসেবে আমাদের হেফাজত করবেন।

আমি এই বইটি নিজের অহম প্রদর্শনের জন্য নয়; বরং হকের ওপর থাকার পরামর্শ হিসেবে লিখেছি। কেননা, আল্লাহ তায়ালা সূরা আসরে মুমিনদের সত্য ও হকের পরামর্শ দেওয়ার তাগিদ দিয়েছেন। অন্যদিকে মুমিনদের বার বার সুপরামর্শ দিয়ে বোঝানোর জন্য তিনি সূরা যারিয়াতেও নির্দেশনা দিয়েছেন,

"তুমি উপদেশ দিতে থাকো। কেননা, উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসে।"
সূরা যারিয়াত : ৫৫

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন। আমাদেরকে তাঁর আদেশ মেনে চলার এবং তাঁর পূর্ণ আনুগত্য করার তাওফিক দিন। আমরা যেন রাসূল সা.-এর সুন্নাহ মোতাবেক জীবনকে পরিচালনা করতে পারি। আমিন।

***

আলী আহমাদ মাবরুর

আলী আহমাদ মাবরুর। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর। ছাত্রজীবনে গোল্ড মেডেলিস্ট হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। একটি জাতীয় দৈনিকে সাব-এডিটর হিসেবে পেশাগত জীবনের সূচনা। দিগন্ত টেলিভিশনের ইংরেজি সংবাদ বিভাগে কাজ করেছেন দীর্ঘদিন। সাংবাদিকতার পথ ধরে একসময় লেখালেখির জগতে প্রবেশ করেছেন। অনুবাদ সাহিত্যে ইতোমধ্যে নিজের অবস্থান সংহত করে নিয়েছেন। প্রাঞ্জল সাবলীল লেখার হাত তাকে এনে দিয়েছে দারুণ পাঠকপ্রিয়তা।

লস্ট ইসলামিক হিস্ট্রি, মুসলিম চরিত্র, পাবলিক ম্যাটারস, ইসলামিক ম্যানারস, আল্লাহর ভালোবাসায় সিক্ত যারা, ইয়ুথ প্রবলেম, মরুভূমির রাজা, যুব প্রজন্মের প্রতি হিতোপদেশ প্রভৃতি প্রকাশিত অনুবাদ বই। *হামাস : ফিলিস্তিন মুক্তি আন্দোলনের ভেতর-বাহির* প্রকাশিত মৌলিক বই।